প্রকাশক ঃ
কে. নাথ / এস. নাথ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ
বিশ্বজিৎ ভৌমিক

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ আশ্বিন, ১৩৬৬

মুদ্রক ঃ
শ্রীরাধারমণ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার পরমগুরু
সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষদস্তিদার মহাশয়ের
করকমলে।

॥ প্রাক কথন ॥

আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার জন্য যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্য-কবিতা হইতে। অধিকন্তু বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদিও পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

সংগৃহিত তথ্যাদির আলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্য-সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তিভূমি হইতেছে মানুষের ধর্মচর্চা এবং সঙ্গীত। কখনও ধর্ম সাহিত্যকে স্পর্শ করিয়াছে লোকায়ত ধর্মের ভূমি হইতে আবার কখনও বা ধর্মের চিরায়ত দর্শন ও আচার-অভিচার বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। তবে বাংলার প্রাচীন কাব্য-কবিতার ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সাহিত্য সৌন্দর্য তাহাতে ক্ষুণ্ন হয় নাই, বরং সাহিত্য-ধর্ম, সঙ্গীত একাত্ম হইয়া এক অনন্য শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পশ্চাৎপটে বাঙ্গালীর সঙ্গীত চেতনা ও অবচেতন সংস্কার যে সক্রিয় ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চর্যাগীতির কাল হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পর্যন্ত সর্বত্রই সঙ্গীত সুধার সঙ্গে সাহিত্যের রস সংমিশ্রিত হইয়াছে। রাজা-মহারাজা-রাজসভা যেমন বাংলা সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছে, তেমনি জনগণের সাহিত্য-সঙ্গীত রসিকতাও সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্য-কবিতার ললাটে তাই কবিরা রাগ-রাগিণীর তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। বস্তুত, দরবারী সাহিত্য সৃষ্টি গীত সুধারসে ছিল অভিষিক্ত। সমান্তরালভাবে জনগণের সাহিত্য-সঙ্গীত সৃষ্টি বাসনা সাহিত্যে নবরাগ সংযোজন করিয়াছিল।

সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম যেমন সঙ্গীতকে সাহিত্যে বেণীবন্ধন করিয়াছিল তেমনি মনসা-ধর্ম-শিব-পার্বতী-শীতলা, বৈষ্ণবীয় প্রেম দর্শন, পদাবলী, গীতিকা, আখ্যান কাব্যে সর্বত্রই সঙ্গীত ফল্গুর মত প্রবাহিত। এই রসস্রোতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গসাহিত্য অভিস্নাত। যথাসম্ভব তথ্যাদি সহযোগে আমি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা সঙ্গীত। সে সঙ্গীত কোথাও ধ্রুপদী আবার কোথাও লৌকিক। অর্থাৎ সর্বত্রই মানুষের সচেতন সঙ্গীত-ধর্ম-সৃষ্টি প্রয়াস প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই কারণেই ঐ যুগের সাহিত্য মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। সাহিত্য ও শিল্পের

সঙ্গে বাঙ্গালীর এক নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। প্রকারান্তরে সঙ্গীতই ঐ যুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রধান অনুপ্রেরণা। পরবর্তীকালের বাংলা গীতি-কবিতা সৃষ্টিতে এই যুগের সাহিত্য প্রেরণা অনস্বীকার্য। গ্রন্থের শেষাংশে নির্বাচিত কাব্যাংশ সংকলন করিয়া সাহিত্যে রাগ-রাগিনীর উল্লেখে যে কাব্য সাহিত্যকে গেয় করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই গবেষণা কর্মে আমাকে নানাভাবে উপদেশ দান করিয়াছেন আমার সঙ্গীতগুরু শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার সঙ্গীত শাস্ত্রী মহাশয়; বস্তুতঃ তাঁহার ঐকান্তিক সহায়তা ভিন্ন কোনদিনই আমার এরূপ গবেষণা কার্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়া আমাকে অশেষ সহায়তা করিয়াছেন লোকসঙ্গীত সংকলক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ দুলাল চৌধুরী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার বসু।

অধিকন্তু এই কর্মে আমাকে অশেষ প্রেরণা দান করিয়াছেন আমার সাঙ্গীতিক জীবনের গুরুমা শ্রীমতী অঞ্জলি ঘোষ দস্তিদার (সঙ্গীত প্রবীণ), শ্রীমতী সাধনা চৌধুরী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সঙ্গীত বিভাগীয় প্রধান লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও ডঃ কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণবদ্ধ। তাঁদের চরণে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

নীতা সাহা কুঠিয়াল

ভূমিকা

অতি প্রাচীনকালে কোন্ পুণ্যলগ্নে মানুষের জীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও সেই সন্ধিক্ষণেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের আত্মার বিকাশের সূচনা শুরু হয়। যে সময় মানুষের অন্তরে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই, পশুপক্ষীর মত বনে-প্রান্তরে ঘুরিয়া সে জীবনধারণের উপকরণ আহরণ করিয়া বেড়াইয়াছে সেই সময় হইতেই প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের সাথে নিজের অন্তরে আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে।

মানুষ চিরদিনই অনুকরণপ্রিয় হইলেও নিজ আত্মার বিকাশ ও প্রকাশের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে কদাচ অস্বীকার করে নাই। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের জটিল আবর্তে জীবনের পরিক্রমা অনিবার্য মৃত্যুর অসীমতার মধ্যেই মিলাইয়া যায়; জীবনের এই পরিক্রমতা নিছক স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন হইলেও প্রকৃতির অকৃপণ সুধারসে মানব অন্তর অহরহ সঞ্জীবিত।

প্রথমদিকে মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দের সাথে পরিচিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে জীবজন্তুর ডাক, ঝরণার জলপ্রপাত, নদীর কল্লোল, গভীর অরণ্যে বাতাসের ধ্বনিতে মনোনিবেশ করিয়া অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদিও তদানীন্তনকালে ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমেই একজন অপরজনের সঙ্গে ভাষা ও ভাব বিনিয়োগ করিত, বিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ মানুষ ভাষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করিতে লাগিল।

মানবজীবন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিময় হইলেও এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতার জন্য প্রকৃতির অন্যান্য অনুষঙ্গ হইতে সে পৃথক। ক্রমে দৈহিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়া মানুষের অন্তর অপর এক প্রয়োজনীয়তাকেও উপলব্ধি করিল।

অনুরূপ উপলব্ধি জগতের মাঝে প্রকাশ করার জন্য অন্তরের আকুলতা ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল। মানুষের বহির্বাস যেমনই হউক অন্তর্জীবনে একাকীত্বকেই সে বরণ করার অভিলাষী এবং সেই একাকীত্বই তাহাকে কল্পনা করার, অন্তরের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করিবার এবং প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে শক্তিদান করিয়াছে। জাগতিক সত্যকে উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করাকে 'সাহিত্য' নামে আখ্যা দেওয়া যায়।

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ ও অভিনয়কে ক্রমশঃ মানুষ তাহার অন্তরের উপলব্ধতাকে প্রকাশ করিবার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মানুষের

অন্তরে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রাংকণ, অভিনয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ভাগ করিলেও মূলতঃ একই শক্তি কাজ করে।

বলাবাহুল্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিশেষ লয় ও ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। লয়ের অস্বাভাবিকতায় ধ্বংস অনিবার্য হইয়া ওঠে, সুতরাং সৃষ্টির স্থিতিবস্থায় পৃথিবীর সকল প্রাণবায়ু এবং জড় পদার্থও এই লয় ও ছন্দের দ্বারা পরিচালিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে অনুকরণ মানুষের সহজাত শক্তি এবং মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন শ্রুতিমধুর সম্মিলিত ধ্বনিকে স্বীয় অন্তরে গ্রহণ করিয়া মর্মমূলের এক গভীর অন্তর্বেদনা কণ্ঠের ধ্বনির মাধ্যমেই প্রকাশ করিয়াছে— ইহাই আদি স্বর। এ ছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার সম্ভাবনা না থাকিলেও এক বিশেষ শক্তি অন্তরের অন্তরলোকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, মানবজীবনের প্রাথমিক পর্যায়েও মানুষ আদি স্বরের মাঝেই ওংকার ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের ফলে নানান ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর স্বভাবজাত অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা সমগ্র মানবজাতি এক বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়, আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টায় অরণ্যাচারী মুনি বা ঋষিগণ গভীর অরণ্য হইতে তাঁদের অভিষ্ট দেবতা অগ্নির ধ্যানকরণ এবং যাগযজ্ঞাদির প্রচলন করিতে থাকেন। যজ্ঞের আহুতিকালীন সময়ে নাভীমূল হইতে এক স্বর বিশিষ্ট বিশেষ এক স্বর কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে থাকে। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতির অন্যান্য সকল শ্রেণীর ধ্বনি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই সময়ে অপর দিকে সাধারণ জনগোষ্ঠী যে স্বরে তাহাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিত, তাহা দুই বা এক স্বর বিশিষ্ট হইলেও ক্ষণস্থায়ী এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইত। বিভিন্ন জীবজন্তুর আচরণ অনুযায়ী মানবিক আনন্দ দেহের নানা অঙ্গভঙ্গি নৃত্যের মাধ্যমে এবং করতালি সহ তাল ও ছন্দের ক্রিয়াও প্রকাশ পাইতে থাকে।

আদিম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের অপরিণত ধ্বনির প্রকাশ বিধি ও বৈদিক যুগে বিবিধ ধ্যান-ধারণাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আপন স্বাতন্ত্র্যতা অর্জন করিল। লোক শিক্ষক মানসকল্পে বৈদিক ঋষিগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া যাগযজ্ঞাদি, ধ্যান, আধ্যাত্মিক চিন্তা, লৌকিক উপদেশাবলী প্রভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ইহাই 'ঋক্‌মন্ত্র' নামে খ্যাত। স্বর সহযোগে উক্ত মন্ত্রগুলি সামগানে রূপান্তরিত হইল। পরবর্তী পর্যায়ে আরণ্যক সংহিতা, পূর্বাচিক, উত্তরাচিক, গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, ঊহ, ঊহ্য, স্তোভ, স্তোম ইত্যাদি রূপে নানাবিধ মন্ত্রগীতির বিভিন্নরূপ প্রকাশ হইতে লাগিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে সামগানের স্তোত্রগুলি এক স্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুর বৈচিত্র্যহীন আবৃত্তিমূলক রূপেই পরিবেশিত হইত, বর্তমানে আদিবাসীদের সুরেও উক্ত সুরের ছায়া পাওয়া যায়। ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষ সাধনার দ্বারা উচ্চ-নীচ স্বরের বিকাশ সাধনে তৎপর হইয়া ওঠে।

বৈদিক যুগের সূচনাকালে স্মৃতি ও শ্রুতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু ভাষার অস্পষ্টতা এবং লিখিত প্রামাণ্যতার অভাব প্রকটিত হওয়ায় ক্রমশঃ মৌখিক সাহিত্যের সূচনা সম্ভব হইয়া ওঠে। ঋক্ বৈদিককালে সভ্যতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। ঋষিগণের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি সেই সময় লিখিত রূপে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং মৌখিক সাহিত্যকে রক্ষা করার জন্য লিখিত সাহিত্যের সূচনা হয়। বর্তমান সাহিত্যের উৎপত্তি, সংজ্ঞা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনামূলক বিশ্লেষিত হইলেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবলমাত্র প্রয়োজনকেই স্বীকার করা হইয়াছে। বেদ রচয়িতাগণ আর্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের রচনা বা সংকলন সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায় ক্রমে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সঙ্গীত ও সাহিত্যের এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সময় ভাষার সৃষ্টি হয় নাই এবং সভ্যতার আলোকের প্রকাশ ছিল না সে সময়েও মানুষ পশুপক্ষীর ডাককে অনুসরণ করিয়া আপন প্রাণের আবেদন ও আকুতি একশ্রেণীর 'টু টু' শব্দযোগে প্রকাশ করিতেন। ক্রমবিবর্তনের ফলে নানা শ্রেণীর জাতির সংমিশ্রণে ভাব ও ভাষার সূচনা হতে থাকে।

সামবেদকে সকল শ্রেণীর সঙ্গীতের মূল উৎস বলা হইয়াছে। জীব বিজ্ঞানীগণ এবং দার্শনিক পণ্ডিতেরাও শিব-শক্তির মিলনকে এবং পশুপক্ষীর ডাক তথা শব্দকে সঙ্গীত সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ব্যক্ত করেন।

মানুষের ভাষা প্রকাশের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে সাহিত্যের সূচনা ঘটে। যে সময় অনার্যগণ আর্য সংস্পর্শে আসে সে সময় দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষারও মিলন হইতে থাকে; পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যভাষা প্রবাহের প্রবল স্রোত বইতে থাকে এই রূপেই সম্ভবতঃ সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল।

ভাষা থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি, ঋকবেদের স্তোত্রগুলির মধ্যেই আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্যভাষা ও সংস্কৃতি প্রাচীন অর্থাৎ প্রাক্-বৈদিক ধারায় বিভক্ত ছিল। ঋকবেদের প্রাচীন এবং যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ উপনিষদ অংশ, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণগুলি অর্বাচীন হিসাবে পরিচিত হয়। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পাণিণি তাঁহার 'অষ্টাধ্যায়ী'

নামক গ্রন্থে ভাষার কঠিন নিয়মশৃংখলা প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত ভাষা গড়িয়া ওঠে। এই রূপে ভাষাগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার মানও উন্নত হইতে থাকে। কালের বিবর্তনে নানা জাতি, বর্ণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সাহিত্যের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়। সাহিত্যে কঠিন বাস্তব সত্যকে এক অলৌকিকতার রঙ্গে তুলি বুলাইয়া সৌন্দর্য পিপাসিত মানব অন্তরের অন্তঃস্থলে এক চির বিরহের ধ্বনি অহরহ প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে, এই বেদনাকে প্রকাশিত করিবার জন্যেই মানুষ ললিতকলার আশ্রয় নিয়াছে; তম্মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রধান। সঙ্গীত ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক হইলেও সাহিত্যের পূর্বেই সঙ্গীতের সাথে মানব আত্মার পরিচিতি। ক্রমবিবর্তনের সাথে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে সঙ্গীত ও সাহিত্য সততই নতুন চিন্তাধারার সূচনা করে। ফলে প্রাচীনতাকে অস্বীকার না করিয়াও সঙ্গীত ও সাহিত্যের এই গতিশীল বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। সাহিত্য জীবনের শিল্প এবং সাহিত্যের কাব্যাংশ সুরের মাধ্যমে চিত্রায়িত করার নামই সঙ্গীত। এই যুগ্মকলার মাঝেই অমৃতের পুত্র মানবের সাধনা নিহিত।

প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের যুগ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এমন কি রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল পর্যন্ত সেই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য প্রসারিত ও পরিব্যপ্ত। এই গবেষণাপত্রে বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার সেই ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল, সমাবেশ, বিকিরণ ও তাৎপর্য পর্যালোচিত হইয়াছে। সঙ্গীত একটি জাতির জীবনে যে কত গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে তাহারই একটি অন্তরঙ্গ চিত্র এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্য নয়; বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সাধনার মর্মবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এই সাহিত্যে। নানাবিধ রাগরাগিণী ও সুর তাল বাঙ্গালীর প্রাণকে সরস-সজীব করিয়াছে। এই সজীব সচল প্রাণ ও আত্মার চৈতন্যকে অনুসন্ধান করিয়াছি আলোচ্য গ্রন্থে। গানেই বাঙ্গালীর মুক্তি—এই সত্যটি মুখর হইয়াছে বাঙ্গালীর সেই কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনার মধ্যে। এই গবেষণা পত্রে বাঙ্গালীর আত্মানুসন্ধানের মরমিয়া সূত্রটি মৌখিক চিন্তায় অনুধাবন করার আন্তরিক প্রয়াস।

সাহিত্য জীবনের আদর্শায়িত রূপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বিশাল প্রকৃতির প্রাণরসে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য বিহার করে। সাহিত্য যেখানেই

জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করিয়া সজীব হইয়া ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী।[১]

সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয়ই মহান শিল্প। অমৃতের পুত্র মানবের সাধনা নিহিত রহিয়াছে তাহার সৃষ্টির মধ্যে। সাহিত্য ও সঙ্গীত অপরা কলা বিদ্যা। উভয়ের মধ্যে মিল ও অমিল লক্ষণীয়, সঙ্গীতের রস সাহিত্য রসের অপেক্ষা আপাতদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বলিয়া ধরা হয়। পুনরায় সাহিত্য সঙ্গীত অপেক্ষা বাস্তব বলিয়া মনে হয়। সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের জাগতিক দিকটা সঙ্গীতের চেয়ে কিছু বেশী। সেদিক হইতে গীতিকবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের মিল বেশী।

রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরিয়া কথকেরা শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া চলিয়াছেন। মধুর কণ্ঠস্রাবী কথকথার প্রভাব শ্রোতার মনে অপরিসীম। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বিভিন্ন রাগের মাধ্যমে গীত হয়। সুতরাং ভাব রসে সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট সাহিত্য ব্যতিত উৎকৃষ্ট গীতের সৃষ্টি করা যায় না। সমগ্র পদাবলী কীর্ত্তন এবং ধ্রুপদ গানের পদগুলি তাহার সাক্ষ্য।

সঙ্গীত ও সাহিত্য এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানব সভ্যতার মূলধারক এই সঙ্গীত ও সাহিত্য একই বৃন্তে দুইটি ফুলের মতই বিকশিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গভাবে মিশিয়াছে। এই গবেষণাপত্রে সেই সাঙ্গীতিক পটভূমি ও স্বরূপ উদ্ঘাটিত করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই দুরূহ সন্ধানকর্ম নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়াছে।

প্রথমে বাঙ্গালীর জাতিসত্তার পরিচয় সন্ধান করা হইয়াছে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যের আলোকে। সেই সঙ্গে প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় সংক্ষেপে পরিবেশিত হইয়াছে। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও ধারা বঙ্গভূমির পটভূমিতে যে অভিঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সুদূর ব্যাপ্ত প্রভাব কতটা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গ কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাহার রূপগত ও রেণুগত বিস্তৃতিই বা কতটুকু তাহা নির্ধারণ করার প্রয়াস রহিয়াছে এই গ্রন্থে। চিরায়ত ও লোকায়ত সঙ্গীতের বিকিরণ কতটা প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্যে মিশ্রিত রহিয়াছে তাহাও নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরিশেষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্যে কলার প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নির্দেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মূলতঃ সঙ্গীতাশ্রয়ী এবং সঙ্গীত সংহতি বাংলা সাহিত্যকে সরস সজীব ও কালজয়ী করিয়াছে।

১. সাহিত্যের স্বরূপ—বিশ্বভারতী, ১৯৬৯ পৃঃ ৫১-৫২।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গের উদ্ভব ও বাঙ্গালী জাতির পরিচয়

মানব জাতির পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশ পলিমাটির দেশ। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দেশ নবীন হইলেও ইহার উত্তর, দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে প্রাচীন ভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য প্রদেশে প্রত্নপ্রস্তর যুগের শিলা নির্মিত আয়ুধ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বঙ্গদেশের সমতলভূমিতেও এই জাতীয় অস্ত্রের সন্ধান মেলে। নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমবঙ্গের সিংভূম জেলার চাইবাসা নগরে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। বঙ্গদেশের প্রত্নাশ্মর অথবা প্রস্তর যুগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় শুশুনিয়া পাহাড়ে। তাম্রাশ্মর যুগে বাঙ্গালীরা কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র সমূহ ব্যবহার করিত এবং এই যুগ হইতেই মানব সভ্যতার নিদর্শন মেলে।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সর্বপ্রথম অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরাপথের পূর্ব সীমান্তস্থিত এই সকল প্রদেশ সমূহ সম্ভবতঃ আর্য জাতির নিকট পরিচিত থাকিলেও অধিকারভুক্ত ছিল না ; সুতরাং এই সকল অঞ্চলে আর্য জাতির বসবাসের সম্ভাবনা কম। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসীগণের সহিত চের জাতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় আর্যগণ যাহাদের পক্ষী জাতীয় মানুষ হিসাবে মনে করিতেন তাহারা সকলেই সম্ভবতঃ একই বংশোদ্ভূত। নৃতত্ত্ববিদগণ এদের দ্রাবিড় জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন।

সম্প্রতি প্রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হল্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দ্রাবিড়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইহারাই বাবিরুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।[১] বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সুমেরীয় জাতির প্রতিমূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির অবয়ব বর্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ ও

১. H. R. Halls—The Ancient History of The near East—Page : 171—174.

মগধের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করা হয়। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে আর্য জাতীয় বলিয়া মনে করা হইলেও বঙ্গবাসিগণ দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলিয়া ধারণা করা হয়। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য সভ্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল এবং বঙ্গ ও মগধের প্রাচীন অধিবাসীগণ পুরাতন ভাষা ও রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য জাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

'বঙ্গ' শব্দটি লইয়া অনেকের গবেষণার বিষয় হইলেও চীন-তিব্বতীয় অধিবাসীগণ 'অং' শব্দাক্ষরটি 'গঙ্গা' শব্দাক্ষরটি হইতে লইয়াছে। 'অং' শব্দের অর্থ জলাভূমি। তিন হাজার বছর পূর্বে বাংলার অধিকাংশ স্থানই বিশেষতঃ ভাগীরথী পূর্ব ও পূর্বান্তর পার জলাভূমি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্বপ্রাচীন 'বঙ্গ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে।[১] রামায়ণ, মহাভারত, জৈনগ্রন্থ ও বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গের নামোল্লেখ আছে। পূর্বে জাতি নাম অনুসারে দেশ নামের প্রচলন ছিল (অস্তি মগধেষু চম্পকবতী নামারণ্যানী, "বঙ্গেষু আহববর্তিন" ইত্যাদি)। 'বঙ্গ' জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল 'বঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয়।[২]

মহাভারতের আদিপর্বে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমসের গল্পে জানা যায় যে বালির পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মের নামানুসারে দেশ নামের পরিচিত হয়। খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলীর "মহাভাষ্য" গ্রন্থ থেকে জানা যায় পূর্বে ভারত অঙ্গ, বঙ্গ, ও সুহ্ম এই তিন বিভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান অঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ বিহারে এবং কিছু অংশ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে পড়িয়াছে।

জলময় অঞ্চল "বঙ্গ" নামে অভিহিত ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল (বর্তমান সুন্দরবন-যশোর-খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ) বঙ্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বর্তমান ত্রিপুরা, সিলেট, নোয়াখালি অঞ্চল)। বঙ্গের

১. বাঙালীর ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। ১৯৭৪। পৃষ্ঠা: ২০।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। ১৯৭৬। পৃষ্ঠা: ৫।

উত্তর ও উত্তর মধ্য অংশ পুন্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত হইত এবং এর সীমানা ছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীর, উত্তর-তীরস্থ অঞ্চলগুলি "বরেন্দ্র" নামে অভিহিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্বের সীমানা ছিল গঙ্গা। পূর্বে এ অঞ্চলটি "সুহ্ম" নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে "সুহ্ম" নামে দেশ নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কালিদাস পশ্চিমবঙ্গকে 'সুহ্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১] অষ্টম শতাব্দীতেও এই নামেই পরিচিত ছিল। নবম-দশম শতাব্দী হইতে এই অঞ্চলটি "রাঢ়" অঞ্চল নামে অভিহিত হইতে থাকে। "রাঢ়" অঞ্চল দুই অংশে বিভক্ত। অজয় ও দামোদরের উত্তরে উত্তর-রাঢ় এবং অজয়ের পূর্বে ও দামোদরের দক্ষিণ ও পূর্বের উভয় দিককে দক্ষিণ রাঢ় বলা হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হইতে উত্তর-রাঢ় অঞ্চলই "রাঢ়দেশ" নামে উল্লিখিত হইতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পাওয়া যায়।

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ।।

পানিনি সূত্রে "গৌড়" বলিয়া একটি দেশের নাম পাওয়া যায়। "গোণ্ড" এই জাতিবাচক নামের সহিত গৌড় নামের সামঞ্জস্য থাকায় গৌড়জনের দেশই গৌড় বলিয়া মনে করা হয়। উত্তর ভারতের একাধিক অঞ্চল একদা গৌড় বলিয়া খ্যাত ছিল। ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে গৌড় বলা হইত। প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল, এই স্থানকেই তাম্রলিপ্ত (প্রাকৃতে দামলিপ্ত) তামলি জাতির (সমুদ্র বণিক যাত্রী) নামানুসারেই সম্ভবত তাম্রলিপ্তের নামকরণ করা হইয়াছে।

পাক্ মুসলমান যুগে "বঙ্গ" ও বঙ্গাল দুইটি শব্দই বাংলার দুই ভিন্ন অংশকে নির্দেশ করিত। "বঙ্গ" শব্দটি দ্বারা বাংলার বিশেষত ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অংশকে বোঝাইত। "বঙ্গ" শব্দটি স্থানবাচকে রূপান্তরিত হইবার পূর্বে কোমবাচক শব্দ ছিল। আরঙ্গজেব বাংলা বা বাঙ্গলাকে বলিয়াছেন "ভারতের স্বর্গ" (Paradise of Nation).

"বাঙ্গ" শব্দ "লা" প্রত্যয়ান্ত হইয়া বাঙ্গালা হইতে পারে। ফারসী "বাঙ্গলহ" হইতে পোর্তুগীজ বেঙ্গলা এবং ইংরাজী "বেঙ্গল" শব্দ আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। বঙ্গ শব্দটি জাতিবাচক বলিয়া অনুমিত হয়। "বঙ্গ" বা 'বং' শব্দ

১. রঘুবংশ—কালিদাস।

হইতেও বাঙ্গালা বা বাংলা শব্দের উদ্ভব সম্ভব। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে ষষ্ঠ শতকের পরবর্তীকালে "বঙ্গাল" নামক একটি দেশের উদ্ভব হইয়াছিল "বঙ্গ" জাতিবাচক শব্দ হইতে অবশ্য, সমগ্র দেশটি "বেঙ্গল" (Bengal) নামে খ্যাত হয় ইংরেজ অধিপত্যের পর। আজ অবশ্য "বেঙ্গল" ঐতিহাসিক কারণে 'বাংলাদেশ" ও "পশ্চিমবঙ্গ" -এই দুই খণ্ডে খণ্ডিত। অথচ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক এবং অভিন্ন।

Bengal : The region of the Ganges Delta and the Districts immediately above it ; but often in English use with a wide application to the whole territory garrisoned by the Bengal army. This name does not appear so far as we have been able to learn in any Mohammedan or Western writing before the later part of the 13th century.

In the earlier part of that Century the Mohammedan writers generally call the province Lakhnaoti, after the chief city but we have also the old form Bang, from the indigenous Vanga. Already, however, in the 11th Century we have it as Vangalam on the inscription of the great Tanjore Pagoda. This is the oldest occurance that we can cite.

The alleged city of Bengala of the Portuguese which has generally purplexed geographers, probably originated with the Arab Custom of giving and important foreign city or seaport the name of the country in which it lay (compare the city of solmandala under Coromandel). It long kept a place in maps. The last occurance that we know of is in a chart of 1743, in Dalrymple's collection, which identifies it with Chittagong, and it may be considered certain that Chittagong was the place intended by the older writers (see Vertherme and Orington). The former, as regards his visiting Banghalls, deals in fiction—a thing clear from internal evidence, and expressly alleged, by the judicious Garcia de Orta : "As to what you say of Ludovice Vartomano, I have spoken both here and in Portugal, with men who know him here in India, and they told me that he went about here in the garb of a Moor, and then reverted to us, doing penace for his sins ; and that the man never went further than Calecot and Cochin.

……*Hobson Jobson*

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়

একটি জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ভৌগলিক পরিচয় ব্যতীত সেই জাতির সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এক কথায় সংস্কৃতিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষের জৈবিক বিকাশ একই জিন সূত্র হইতে বিকশিত হইলেও মানুষের মানসিক, চারিত্রিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু একটি মানবগোষ্ঠী তাহার ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক সম্পদ আশ্রয় করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বাঙ্গালী জাতি হিসাবে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা সংযোজিত করিয়া লইয়াছে। ফলে ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প বৈচিত্র্য মণ্ডিত হইয়া একটি জাতির জীবনকে অনন্যতা দান করিয়াছে। সেই সূত্র ধরিয়াই এখানে প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পরিচয়ের সঙ্গে বাঙ্গালীর শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের অখণ্ড যোগসূত্র ধরিবার চেষ্টা করা যাক্। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের (সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য) পর্যালোচনা করিলে আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে দেশ ও কালের প্রভাব প্রতিফলিত হইতে দেখা না গেলেও অপ্রত্যক্ষভাবে একটি জাতির আধিমানসিক সত্তা যে এ গুলির মাঝে লুকাইয়া আছে তা আমরা অনুধাবণ করিতে পারি।

দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝে ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন হইতে দেখা যায় এবং ক্রমশঃ ইহার ঢেউ বাংলা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হয়। এখানে সামাজিক পরিস্থিতি বলিতে সেই যুগের বাংলাদেশের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চা ও দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি সকল দিকগুলি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গের নামোল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ ও বঙ্গাল' এই দুই নাম লইয়া নানাবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যযুগে বাংলা নামে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ বুঝাইলেও প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ ও বঙ্গাল বলিতে যে দেশখণ্ড বুঝাইত তাহা বর্তমান বাংলা দেশের সমার্থক নহে বরং তাহার একটি অংশ মাত্র।

প্রাচীন বাংলা দেশ যে সকল জনপদে বিভক্ত ছিল, বঙ্গ ও বঙ্গাল তাহার

দুইটি বিভাগ, কারণ প্রাচীনকাল হইতে একাদশ—দ্বাদশ শতক পর্যন্ত জনপদগুলির নাম কৌম নামে পরিচিত হইত। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় ইত্যাদি জনপদগুলি কৌম নামানুসারে নামকরণ করা হইয়াছে।

কোন দেশের সামাজিক জীবন যাত্রার প্রবাহ সেই দেশের ভৌগলিক পরিবেশের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয় সীমা দ্বারা দেশের ভৌগলিক সীমা নির্ধারণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের আধিপত্যের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সীমানাও সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইয়াছে।

গুপ্ত রাজত্বকালে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ দুইটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্ব তীরস্থ প্রদেশ ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। পাল ও সেন যুগে বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু গুপ্ত আমলে বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন দুই পৃথক রাষ্ট্র বিভাগে বিভক্ত ছিল[১]।"

একাদশ শতকের শেষে বঙ্গের যে দুইটি বিভাগ ছিল তাহার একটি উত্তরাঞ্চল এবং অপরটি অনুত্তর বা দক্ষিণাঞ্চল। বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রশায়ী খাল নালা সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ।

কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন এই দুই সেন রাজগণের রাজত্বে দুইটি বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে। একটি বিক্রমপুর ভাগ এবং অপরটি নাব্য। লিপি প্রমাণ হইতে ধারণা করা হয় বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত অংশই নাব্য নামে প্রচলিত ছিল, বর্তমান বিক্রমপুর পরগণার সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগণার কিয়দংশ লইয়া ছিল বিক্রমপুর ভাগ।

কোষকার হেমচন্দ্র তাঁহার 'অভিধান চিন্তামণি' তে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গে ও হরিকেলী জনপদ এক ও সমার্থক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিভিন্ন লিপির সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে অনুমান করা হয় হরিকেল সপ্তম ও অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ সমতটের সংলগ্ন, কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল: ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের প্রণেতার মতে বাক্‌লা পরগণার বাকলা সরকার বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলা এবং চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে।

---

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। আদি পর্ব, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—১৩৮২। পৃঃ ৬২।

বরাহমিহিরের (ষষ্ঠ শতক) বৃহৎ সংহিতায় পুণ্ড্রতাম্রলিপ্তক বর্ধমান বঙ্গের সহিত সমতট নামীয় এক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া (মেঘনা মোহনা পর্যন্ত) সমুদ্রশায়ী ভূমণ্ডলকে সম্ভবতঃ সমতট বলা হইত। ইহা বর্তমান চব্বিশ পরগণার খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

একাদশ শতকে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন নাম পাওয়া যায় 'বঙ্গাল'। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়লিপি হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গাল দেশ এবং এই দুই দেশের মধ্যসীমায় সম্ভবতঃ গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহিত হইত।

একাদশ শতকে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী দেশ খণ্ডকে বঙ্গালদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইত। চন্দ্রদ্বীপ ও হরিকেল সেই সময় বঙ্গাল দেশেরই অংশ। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে এই সকল অংশ বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগ ও নাব্যভাগের অন্তর্গত হইল।[১] মানিকচন্দ্র রাজার গানে 'ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ী' পদে অনুমান হয় 'ভাটি' ও 'বঙ্গাল' দেশ কোন এক সময় সমার্থক ছিল, তবে বঙ্গাল দেশের কেন্দ্র স্থান পূর্ববঙ্গে অবস্থিত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। গ্যাসটালডির ১৫৬১ নকসায়ও ইহা প্রমাণিত হয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম পুণ্ড্রজনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থলকে অভিহিত করা হয়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পালরাজগণের পিতৃভূমি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বরেন্দ্রী গঙ্গা—করতোয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ। সেন রাজগণের পট্টোলীগুলিতে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে অনুমান হয় যে বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনাও প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধিস্বরূপ। বরেন্দ্রী উত্তর বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এ সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্য, ইতিহাস, কুলজী গ্রন্থে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্তে' রাঢ় জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গারাজ দেবেন্দ্র বর্মণের একটি লিপিতে প্রথম উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বল্লাল সেনের নৈহাটী পল্লী উত্তর রাঢ় এবং তদন্তর্গত বাল্লহিট্‌ঠা, জলমোহী খাণ্ডারিয়া, অম্বয়িল্লা এবং মোলদণ্ডী ইত্যাদি গ্রামের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সব কয়টি গ্রামই বর্তমান বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার যোগ-সীমায়।

১. বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৩৮২। পৃঃ, ৬৫।

নৈহাটীলিপি অনুসারে উত্তর রাঢ় বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের আমলে উত্তর রাঢ় মণ্ডল কংক গ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর রাঢ়ে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ লইয়া উত্তর রাঢ়।

বাকপতি মুঞ্জেরের একটি লিপিতে প্রথম দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে (একাদশ-দ্বাদশ) রাঢ়ের এবং দক্ষিণ লিপিতেও দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই জনপদটি গৌড় বা গৌড়দেশান্তর্গত বলা হইয়াছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে (১৫৯৭-৯৪) দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীধর ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র দক্ষিণ রাঢ়ের দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রাম দুটির নাম ভুরিসৃষ্টি ও নবগ্রাম। মুকুন্দরাম দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে বর্ধমান ভুক্তির সাক্ষাৎ মেলে, লিপিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমান ভুক্তির সীমা বিস্তৃত। পাল ও সেন আমল ব্যতীত দণ্ডভুক্তি সাধারণতঃ তাম্রলিপ্ত জনপদেরই অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি হইতে জানা যায় যে দণ্ডভুক্তি-দক্ষিণ রাঢ়ে, বঙ্গাল দেশ এবং উত্তর রাঢ় হইতে পৃথক জনপদ রাষ্ট্র। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে এই দণ্ডভুক্তি বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত হয়।

গৌড় নামক স্থানের উল্লেখ প্রাচীন কালের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গেলেও সর্বত্র গৌড় দেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহির, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্ত নামক ছয়টি স্বতন্ত্র জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টম শতকের শেষার্ধে ধর্মপালের সমসাময়িক গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার প্রাচীন অঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে করা হয়।[১] কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রদয়ে' বঙ্গকে রাঢ়াপুরী এবং ভুরিশ্রেষ্ঠীক গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের মতে গৌড়দেশ কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ভবিষ্য পুরাণে গৌড়দেশের উত্তর সীমায় পদ্মা, দক্ষিণ সীমায় বর্ধমান বলিয়া অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোনও কোনও জৈনগ্রন্থে বর্তমান

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। প্রথম খণ্ড। পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ৫ ষষ্ঠ সংস্করণ। ১৯৭৮

মালদহ জেলার প্রধান গ্রাম লক্ষ্মণবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল এই পাঁচটি অঞ্চলকে লইয়া 'পঞ্চ গৌড়' নামে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি নির্ধারণ সম্ভব হয় নাই।

সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এই জনপদের আদি কেন্দ্র এবং পরবর্তীকালে মালদহ ও বর্ধমানও এই জনপদের সহিত ভুক্ত হইয়াছে[১]। বিভিন্ন লিপিতে গৌড়ের অবস্থান নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করা যায় যে গৌড়বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে স্বতন্ত্র জনপদ ছিল এবং বিভিন্ন পণ্ডিতের লিপিগ্রন্থ হইতে জানা যায় 'গৌড়' নামে সমগ্র বাংলাদেশকে অনেক সময় বোঝাইত। 'গৌড়' নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা সেই সময় অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। পাল ও সেন রাজগণ 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচয় জ্ঞাপন করিতে গৌরব বোধ করিতেন। শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজগণ বাংলার সকল জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। 'বঙ্গ' নামটি পাল ও সেন রাজগণ নিকট অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, হিন্দু যুগে না হইলেও পাঠান আমলে বিশেষ করিয়া আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র দেশ সুবা বাংলা হিসাবে পরিচিত হইল এবং বঙ্গ নামের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাদেশের নদ-নদীগুলির গতি পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানারও পট পরিবর্তন হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রধান নদী গঙ্গা। হিমালয়ের গাড়বাল পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গোত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়া সারা উত্তর ভারতের উপর দিয়া গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে তেলিয়াগড় ও সকরিগলির সংকীর্ণ খাত অতিক্রম করিয়া গিরিয়ার নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে একটি ধারা গঙ্গার দক্ষিণ দিকে এবং অপর ধারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ধারাটি মালদহ জেলার গৌড় শহরের ধ্বংসাবশেষের ধার দিয়া প্রবাহিত এবং গৌড় নগর সম্ভবতঃ দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চুচুড়া, চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি শহরের পার্শ্ব দিয়া বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পড়িয়াছে—এই অংশ ভাগীরথী নামে পরিচিত। চুচুড়ার নিকটে ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর শাখা নদী সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গমস্থল। কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ পথ আদি গঙ্গা নামে পরিচিত।

---

১. বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশ মজুমদার। চতুর্থ সংস্করণ। ১৩৭৩। পৃষ্ঠা: ৮

ইহারই তটে কালীঘাটের মন্দির। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ) এই নদী পথে বাণিজ্য তরীর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে—শ্রীচৈতন্যদেব এই নদীপথের উপর অবস্থিত চক্রতীর্থ দর্শন করিয়া তমলুক হইয়া পুরী গিয়াছিলেন।

দশম শতকে পদ্মার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভূসুকুর রচনায় চর্যাগীতির একটি পদে পদ্মা খালের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭) মির্জা নাথনের গ্রন্থে, ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গে গঙ্গার সর্বত্র প্রবাহের নির্দিষ্ট ধারাকে পদ্মা নামকরণ করা হইয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ডহারবারের সাগরসঙ্গম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালে কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন। আবার কখনও খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমি সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে খুলনা বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে মধ্যযুগে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। কারণ এই অঞ্চলের পশ্চিম দিক অর্থাৎ ২৪ পরগণা জেলার শিল্পাঞ্চল পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় অবস্থিত। ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী হইতে নির্গত হইয়া হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর দিয়া পুনরায় ভাগীরথীর নিম্নস্রোতে মিলিত হইয়াছে। পূর্বে ইহাকে ভাগীরথীর খাল বলা হইত, বাঙ্গালী বণিকেরা উক্ত ভাগীরথীর খালপথেই বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, ইহারই তীরে প্রাচীন বন্দর এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শহর সপ্তগ্রাম অবস্থিত ছিল। একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইহার গৌরব অব্যাহত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী সপ্তগ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে সপ্তগ্রাম সরস্বতী হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ার ফলে বাংলার গৌরব অস্তমিত হইতে থাকে।

পাল, কাম্বোজ, সেন, বর্মণ রাজগণের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ থাকিলেও বাংলাদেশে বর্ণবিন্যাস নীতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উচ্চ বর্ণের প্রতিষ্ঠায় সকল রাজগণই একমত ছিলেন। ফলে হাড়ী, ডোম, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের মধ্যে নানাবিধ নিষেধের অন্তরালে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর জনসাধারণের

নানা প্রকার অন্যায় আচরণের পথ সুগম হইলেও সামান্য অপরাধে নিম্ন শ্রেণীদের কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। এইরূপে সামাজিক বৈষম্য ও পক্ষপাত, উচ্চ বর্ণের মধ্যে নানা প্রকার অন্যায় ও ব্যভিচার, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব ইত্যাদি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় দেখা যায়। সাহিত্য যুগ পরিবেশের দর্পণ-বিশেষ। চর্যা রচনার ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিফলন দেখা যায়, একদিকে সমাজের ভেদ-বিভেদের এবং বৈষম্যের চিত্র, অপরদিকে দুঃখপূর্ণ দারিদ্র্য জীবন যাত্রার কখনও পূর্ণাঙ্গ কখনও বা খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায়।

দশম একাদশ শতকে বাঙ্গালীর প্রেম, সুখ, দুঃখ, দারিদ্র্য, ঋতুচর্চা, যুদ্ধ, শৌর্য, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ শ্লোক সম্ভারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। চর্যাগীতিতে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চোর-ডাকাতের উপদ্রবের জন্য শক্ত প্রহরী ও দরজায় তালা লাগাইবার প্রয়োজন ছিল। গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী—একত্র ভোজনের নিয়ম ছিল এবং যৌতুক গ্রহণের প্রথা প্রবলমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। চর্যাগীতির মাধ্যমে জানা যায় শবর-শবরীরা পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় বসবাস করিত, তাহাদের পোষাক বলিতে ছিল গলায় শবরী-কুঞ্জের মালা, কটিতে ময়ূরের পাখনা, কানে কুন্তল, পাণ ও কর্পূর পূর্বরাগের উপাদান হিসাবে ছিল। শর, ধনু লইয়া শিকারের কথাও জানা যায়, ডোম শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের বাহিরে বাস করিত। বাঁশের তাঁত, চাচারী ইত্যাদি ব্যবসা ছাড়াও তখনকার দিনে মৎস্যজীবি, ধুনুরী, তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতি জীবিকাগণের ইতিহাস জানা যায়। ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, বেদে প্রভৃতি নিচু শ্রেণীর বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো বা অন্যান্য যাদু বিদ্যা। সে সময় সাপের উপদ্রব বিশেষ ছিল বলিয়া মনসাপূজার প্রাবল্য ছিল এবং ওঝা ও বিষ বৈদ্যদের সমাজে এক বিশেষ স্থান ছিল।

ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ জীবন সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়। আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ব্যতীত আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল, একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ অপরটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ। এই ভাষার প্রাচীনতম বাংলা সংস্কৃতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে তথা উচ্চবর্ণের স্তরে সর্বব্যাপী হইয়াছিল এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই রচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বিশাখ দত্তের মুদ্রারক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণী সংহার, মুরারী মিশ্রের অনর্ঘ রাঘব, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, নীতিবর্মার কীচকবধ গ্রন্থ

সমূহ বাঙালী মণীষার দান। সেই সময় লোকায়ত ভাষার কৌলিণ্য ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প।

নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্যাপদাবলীর পুঁথি, চর্যাগীতগুলির রচনাকাল লইয়া নানা মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতিহাসিক-গণের মতে পাল রাজগণের পতন ও সেন রাজগণের রাজত্বের সূচনাকালে চর্যাগীতিগুলি রচিত হইয়াছিল। সাহিত্য বা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখযোগ্য অবদান না থাকিলেও বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির মূল্য অপরিসীম।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা জয়দেব, গোবর্ধন আচার্য, কবি ধোয়ী, উমাপতি ধর এবং শরণ প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিত কবিগণের দ্বারা অলংকৃত হইত; জয়দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার গীতগোবিন্দ, গোবর্ধন আচার্যের আর্যা সপ্তশতী, ধোয়ীর পবনদূত, উমাপতি ধর এবং শরণের কাব্যদ্বয়ের বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল সৃষ্টি করিয়াছিল। জয়দেবের বিখ্যাত নাট্যগীতি গীতগোবিন্দের ভাষা, শব্দ, ব্যাকরণ সংস্কৃত হইলেও ইহার ছন্দ রীতিভঙ্গি, অনুভব, প্রাণবায়ু সকল রূপেই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষায় রূপায়িত। কেহ কেহ বলেন মূল গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল শৌরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায় এবং পরবর্তীকালে তাহার উপর একটি সংস্কৃতের আবরণ পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই কারণে জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি রূপে সম্মানিত করা হইয়াছে।

পাল, সেন ও বর্মণ রাজত্বে বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নূতনভাবে গঠন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের রাষ্ট্রে ক্রমশঃ নানাপ্রকার কাম ও যৌন বিলাস দেখা দিয়াছিল, সেন আমলেই বোধ হয় বাংলাদেশে দেবদাসী প্রথা বিস্তৃতি লাভ করে। গীতগোবিন্দ, আর্যা সপ্তশতীর শৃংগার রস সমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত, সকল গ্রন্থই সেই রাজসভার বিলাস লালসায় সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত! বাংলাদেশে যে সময় মুসলমানগণের করতলগত প্রায় সেই সময়ও বিক্রমপুরের রাজসভায় অনুরূপ বৃন্দাবনলীলা চলিতে থাকে। ইহার প্রভাবও সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় কামনার ও প্রেমভক্তির জয় ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

তুর্কী অভিযানের ফলে বেশ কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্টি বিপরীতধর্মী হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোন প্রতিভাধর বাঙ্গালী কবির নাম জানা

যায় নাই। তাতার, তুর্কী, খোরাসান প্রভৃতি ইসলাম জাতির বাংলায় একাংশ দখল করায় পাশব শক্তি ও বর্বর অত্যাচারে দেশ জর্জরিত হইয়া ওঠে ; নগরের অবস্থিত সংস্কৃতি কেন্দ্র সমূহ বিনষ্ট হইয়া পড়ে। রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি পণ্ডিতগণ অন্য দেশে পলায়ন করিলেন অথবা ক্ষমতাহীন হইয়া লুকাইয়া রহিলেন, এই অবস্থায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কোন সুযোগই থাকিতে পারে না। বাংলাদেশে সংস্কৃতির বন্ধ্যাযুগ বলিতে এই শতাব্দীকেই বুঝাইত। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণবান বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই।

গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে ভয়ংকর অরাজকতা পঙ্কিল হইয়া ওঠে নাই সেখানে ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভৃতি লোক সাহিত্যের সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলা দেশের সমাজ ধর্ম. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা আসিয়া পড়িয়াছিল। আর্য সমাজের প্রধান দেবতা ছিল পুরুষ এবং আর্যতর সমাজে প্রধান দেবতা হইল নারী। এই সকল দেব দেবীকে লইয়া মঙ্গল সাহিত্য নামে এক নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মঙ্গল সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মঙ্গল চণ্ডীর গান লোক মুখে ছড়ার আকারে পরিবেশিত হইত। ক্ষেত্র বিশেষে ছোট ছোট পাঁচালী আকারে লিখিত হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাঙ্গলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত হয় এবং এই ইলিয়াস শাহী বংশের সময়ে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাকবি কৃত্তিবাস কোন এক গৌড়েশ্বরের নির্দেশে রামায়ণ কাহিনী রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে কবি মালাধর বসু ভাগবত গ্রন্থের দশম একাদশ স্কন্দ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এবং সুলতান হোসেন সাহর কর্মচারী লস্কর খাঁয়ের নির্দেশে কবিন্দ্র পরমেশ্বর 'ভারত পাঁচালী' বা 'পাণ্ডব বিজয় কথা' নামে মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেদেবের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে এবং ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অসংখ্য কবিকুল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অজস্র পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্য জীবনী, গৌড়চন্দ্রিকা, বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ সাহিত্য এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের শাস্ত্র-গ্রন্থও রচিত হয়। ব্যাপকার্থে বিপুল সাহিত্যকে চৈতনোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বলা হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ অর্থাৎ চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, শাক্ত পদাবলী সাহিত্য সঙ্গীতের আধারে গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ নৃত্য ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সাহিত্য মাত্রই তাই সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে। নদী, নালা, পাহাড় ও অরণ্যের অনন্য সমাবেশ এই দেশকে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিরূপে গড়িয়া তোলে। অধিকন্তু বহু জাতি প্রজাতির মানুষ এই স্থানে বসবাস করিয়া জন সম্পদেও এই দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

এই দেশের মানুষ কর্মে ও ধর্মে সঙ্গীত ও নৃত্যকেই সাহিত্য শিল্পের প্রয়োগ ও প্রযুক্তির অন্যতম অবলম্বন করিয়া তোলে। উত্তর ও মধ্যভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যের ঐতিহ্য আসিয়া 'কোম' গণের সঙ্গীত ও নৃত্যের সহিত যুক্ত হইয়া এক রস সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় বঙ্গভূমিতে। সেই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় সঙ্গীত সাহিত্যকে এমন নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর সঙ্গীত প্রিয়তা তাহার সাহিত্যের নম্রভূমিতে ছন্দ ও সুরের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। উষর প্রান্তর যেমন তাহাকে গভীর দর্শন সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে, তেমনি দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র তট ও নদী তাহার চিত্তে আনন্দের নূপুর বাজাইয়াছে। দেবতার পাদপ্রদীপে বাঙ্গালী যেমন প্রসন্ন চিত্তে আরতি করিয়াছে নম্র দেহভঙ্গিমায় তেমনি সাধন সঙ্গীতে সান্ধ্য মঠ, মন্দির মুখর হইয়াছে। কর্মের মধ্যে বাঙ্গালী আনিয়াছে ছন্দ! জীবনের কঠোর ও কোমলের এমন সহজ মিশ্রণ এবং গীতি কবিতার এমন স্বাভাবিক প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ।

বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রবাহ একদিকে যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক স্তরে বিভিন্ন কোম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সঙ্গীতকলা মিশ্রিত হইয়াছে। ঊর্ধ্ব এবং অধঃ উভয় প্রান্তিক সংশ্লেষে বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যমালা সঙ্গীতের কলানিধি ও পরাগের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে। ফলে সাহিত্য ও সঙ্গীত বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সমন্বিত হইয়া অনন্যতা লাভ করিয়াছে। রাগ চিহ্নিত চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, কবিগান, গীতিকা, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি দরবারী সাহিত্যকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, অন্যদিকে দরবারী রাগ-রাগিনী লোক সাহিত্যকে রাগ রঙ্গে সঞ্জীবিত করিয়াছে। পরবর্তী আলোচনায় সুরু মণ্ডিত কাব্য-কবিতা সমূহের অন্তরঙ্গ বিচার বিশ্লেষণে নিবেদিত।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প ও সংস্কৃতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সংস্কৃতি এক সুবৃহৎ অংশ ভাস্কর্য, অংকন, চিত্র শিল্পের মাঝে লুক্কায়িত। যদিও সম্পূর্ণ নন্দনবোধগত চিন্তা এই যুগের স্থাপত্যের মাঝে প্রস্ফুটিত হয় নাই তথাপি অধিকাংশ শিল্পকলা ধর্মভিত্তিক হওয়ার ফলে সমাজ ও সম্প্রদায়গত ধর্ম ও ঐক্যবোধে ব্যক্তি ও সমাজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

গুপ্তযুগের পূর্বে যে সকল শিল্প নিদর্শন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে তাহা অধিকাংশ পোড়া মাটির; ইহাতে বাংলাদেশের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু ধরা পড়ে নাই। সেই যুগের মধ্যভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতবর্ষে মাটির দ্বারা রচিত প্রতিকৃতির মাধ্যমে নানা গল্প কাহিনী প্রতিফলিত হইত কিন্তু বাংলাদেশের পোখরণা, বাঁকুড়া জিলা তমলুক মহাস্থান প্রভৃতি প্রত্নভূমি হইতে যে কয়েকটি পোড়া মাটির ফলক পাওয়া যায়, তাহাতে নারী মূর্তির বিভিন্ন রূপভঙ্গি, বেশবাস, দেহগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই যুগের রুচি, সংস্কৃতি, সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি, সামাজিক পরিবেশের এক নিগূঢ় চিত্র ধরা পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত কুশান শিল্পশৈলীর কয়েকটি পাথরের মূর্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মধ্য ভারতে আর্য প্রভাবের ফলে যখন যেরূপ শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন হইয়াছে বাংলাদেশে তাহার ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জিলার পোখরণা ও সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপিতে পোড়ামাটির নানামূর্তি বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। ইহার একখানি যক্ষিণীর মূর্তিগঠন প্রণালী ও বসনভূষণ খৃঃ পূঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সুঙ্গযুগের মূর্তির ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বসিরহাটের বেড়াচাঁপায় মৌর্য অথবা সুঙ্গ যুগের অনেক পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। রাজসাহীর কুমারপুর ও নিয়ামৎপুরে দুইটি সূর্যমূর্তি এবং মালদহের হাকুরাইল গ্রামের বিষ্ণুমূর্তির পোষাক পরিচ্ছদ ও গঠনপ্রণালী কুশান যুগের অনুরূপ বলিয়া মনে করা হয়। সুন্দরবনে কাশীপুর ও বগুড়ার দেওরায় (দু ইঞ্চি বিশিষ্ট) ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত যুগের শেষ দিকের শিল্প তত্ত্ব বিদ্যমান। চব্বিশ পরগণার মণিরহাট হইতে প্রাপ্ত ধাতু নির্মিত শিবমূর্তি পালযুগের শিল্প বৈশিষ্ট্যের

কথা স্মরণ করাইয়া দেয়[১]। পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য শিল্প কৌশলে রামায়ণ, মহাভারতের বহু কাহিনী প্রতিফলিত। সেকশুভোদয়া গ্রন্থের গল্প অবলম্বনে একটি চিত্র মন্দিরের গাত্রে অংকিত। অধিকন্তু কৃষ্ণের জন্মকথা, সমুদয় লীলাসহ ও পঞ্চতন্ত্র এবং বৃহৎ হাস্য রসাশ্রিত জনপ্রিয় গল্প তথা সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ জীবন যাত্রার দৈনন্দিন কাহিনী অবলম্বনে প্রস্তর এবং পোড়ামাটির সমুদয় ফলকগুলি যেন লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎকালীন মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিগুলি যেন আজও জীবন্ত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে বাংলায় গুপ্তযুগ হইতেই শিল্পধারা সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিভা ও কঠোর সাধনার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন বাংলার নানাস্থানে প্রদত্ত সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে অনুমান করা হয় ইহাদের প্রায় সকলই পূজা অর্চনার নিমিত্ত দেবদেবীর মূর্তি। সেন বংশের রাজত্বকালে রাজসভা ও অভিজাত শ্রেণীর সমাজ অলংকরণ ও বিলাস ব্যসনের আতিশয্য জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তিতেও তাহার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, রচনাবিন্যাসে ও দেহভঙ্গিতে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার আবেদনে, ডোলে ও গড়নে ইন্দ্রিয়ের ইহমুখীনতার আকর্ষণ।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুঃষ্কোণ নকশার ভিত্তিতে মাটির দেওয়াল বা বাঁশের চাঁচরীর বেড়ায় ঘেরা যে ধরণের ধনুকাকৃতির দোচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বাংলা রীতি নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন বাংলা ধর্মগত বাস্তু হিসাবে স্তুপ বিহার ও মন্দিরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, স্তুপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহিত জড়িত।

প্রাচীন বাংলার রাজশাহীর পাহাড়পুর নামক একটি বিশাল বিহারের ধংসাবশেষ সর্বজনবিদিত। অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপালের যুগে 'সংকুর' মহা বিহার নামক এক বিহারের বিশালত্ব ও সৌন্দর্য মানুষের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। বৌদ্ধ ও জৈনদের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য স্তুপের পরিকল্পনা করা হইত। এই স্তুপকে মন্দিরের ন্যায় বিবেচিত করা হয়। বাংলাদেশেও বহু স্তুপ নির্মিত হইয়াছিল। ঢাকা জিলার আসরফপুর গ্রামে রাজা দেব বর্মার তাম্রশাসনে ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুর নির্মিত একটি স্তুপ পাওয়া যায়। ইহাই সম্ভবতঃ বাংলার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। বৌদ্ধ গ্রন্থে বরেন্দ্রের

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। প্রথম খণ্ড। ষষ্ঠ সংস্করণ। পূর্বার্ধ।

মৃগস্থাপন স্তুপের চিত্র পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় চারি শ্রেণীর মন্দির পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত বরাকরের নিকট একটি মন্দির সর্বপ্রাচীন বলিয়া প্রকাশ। ইহার অনতিকাল পরে রাজসাহী জেলার নিমদীঘি, দিনাজপুরের কান্তনগরে এবং চট্টগ্রামে ঝেওয়ারীতে ব্রোঞ্জ নির্মিত মন্দির সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেউলিয়া মন্দির (বর্ধমান), বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির (বাঁকুড়া), দেহারের মহেশ্বর মন্দির (বাঁকুড়া) এবং সুন্দরবনের জটার দেউল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরে বিহারের অঙ্গনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল ত্রিতল মন্দির আবিস্কৃত হইয়াছে।

পালযুগে চিত্রাংকনের চর্চার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামপালের রাজত্বকালে পঞ্চবিংশতি সহস্রাসিকা প্রজ্ঞা পারমিতার পুঁথি বাংলার প্রাচীন চিত্রবিদ্যা আলোচনার প্রধান অবলম্বন। এই সময় বর্ণ ও সূক্ষ্মরেখা পাতের সাহায্যে শিল্পী চিত্রের মাধ্যমে লীলা মাধুর্যে ও অনবদ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া মধ্যযুগের শিল্প জগতে উচ্চ স্থান অধিকারের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। সুন্দরবনের প্রাপ্ত ডোমনপালের তাম্রশাসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাহার দৃষ্টান্ত।

বাংলার স্থাপত্য শিল্প বা টেরাকোটার কারুকর্মগুলি বিস্তার করিলে আমরা বিশ্বাস করি যে বাঙ্গালী প্রাচীন ও মধ্যযুগে সঙ্গীতকে এবং সঙ্গীতের নানা উপাদানকে জীবনের কর্মে ধর্মে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছিল। যেমন বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী টেরাকোট, বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির টেরাকোটা অথবা মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ীর খিলানের স্থাপত্য শিল্প এবং নানা ধরণের ফুল ও লতার কারুকর্ম দরবারী পরিবেশের উপযোগী নানা ধরণের সাজসজ্জা হইতে প্রমাণ করে যে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ঘরাণাগত কারুকর্ম বা অন্যান্য অলংকরণ তাহার সঙ্গে একই স্থাপত্য রীতি ও শিল্প কর্মের সূক্ষ্মতম প্রকাশের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীত যখন পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার যৌবনপথ নানা সৌন্দর্যে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়। বাংলার স্থাপত্য কলার দিকে নজর দেওয়া হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে সঙ্গীত ও স্থাপত্য যেন যুগপৎ পাল্লা দিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নততর মহিমাকে ঘোষণা করিয়াছে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহারের আকৃতি কালক্রমে বাদশাহী মীনার ও গম্বুজের অলংকরণ মোগল-যুগের সমৃদ্ধ স্থাপত্যরীতিকে যেমন স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে নানা বৈচিত্র্যমণ্ডিত বিকাশের কথাও এই যুগে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এতক্ষণ বাংলার ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালীর আত্মবিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অংকন করা হইয়াছে। কারণ একটা জাতির আত্মবিকাশ কোন এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়।

বাঙ্গালীর বাংলা ভাষায় কাব্য-কবিতা রচনার প্রথম অভিজ্ঞান চর্যাগীতি। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত এই চর্যাগীতিগুলি সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের সাধন সঙ্গীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মানসিক ও সাহিত্যিক প্রয়াসের দর্পণ।

ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন: চর্যাগীতিগুলি তত্ত্ব সাধনা ঘটিত পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত ও লৌকিক অনির্বচনীয় উৎপ্রেক্ষায় আকীর্ণ, কিন্তু গান বলিয়া রসহীন নয়।[১]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "কবি সঙ্গীত" পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতিকবিতাই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান গৌরব স্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্প মঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।[২]

চর্যাগীতির কাল হইতে ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" কাল পর্যন্ত—দীর্ঘ আট শত বছরের মধ্যে ইতিহাসের নানা উত্থান পতনের প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী কবি অসংখ্য কাব্য-কবিতা, আখ্যান ও গীতকাব্য রচনা রচিয়াছেন। মূলতঃ এই কাব্যমালার সঙ্গে সঙ্গীত হর-পার্বতীর মত সংযুক্ত হইয়া আছে।

---

১. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড। পূর্বার্ধ ১৯৭৮, পৃঃ ৬৫।

২. লোকসাহিত্য—বিশ্বভারতী, ১৩৬২ শ্রাবণ, পৃঃ ৭৮।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সঙ্গীতাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ কাব্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। শব্দ বাক্যে প্রকাশিত কাব্যবস্তু স্রষ্টা ও শ্রবণকারী উভয়ের মানসিক ও বৌদ্ধিক চেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এবং চিত্তে আনন্দের রসস্বাদ বহন করিয়া আনে। প্রাচীনকালে আচার্যগণ কাব্যলক্ষণ বিষয়ে নানা সার্থক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তার মাঝে 'সাহিত্য দর্পনকার' বিশ্বনাথ কবিরাজের 'কাব্যলক্ষণ' সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তা বাংলা কাব্য আলোচনায় বিশেষভাবে প্রচলিত।[১] তিনি বলিয়াছেন—

"কাব্যং বাক্যং রসাত্মকং" অপরদিকে কাব্যের স্বরূপে আচার্য ভামহের উক্তি—"শব্দার্থৌ সহিতো কাব্যম্"—এখানে শব্দার্থের সহায়তায় যে কাব্যের প্রকাশ তার ইঙ্গিত দান করে।

কাব্য ও গীতকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা সম্ভব হইলেও প্রকৃতিগত ভাবধারায় উভয়ের মাঝে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। চারিত্রিকগতভাবে কাব্য ও গীত মানুষকে বাস্তব জীবন মুখীনতা হইতে এক অতিন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে প্রেরণ করে এবং মানুষ কাব্যপাঠ ও গীতশ্রবণে এক সচ্চিদানন্দের স্বাদ অনুভব করে।

বাক্যের শব্দার্থে যেমন কাব্যকে রসাপ্লুত করিয়া তোলে, কণ্ঠোচ্চারিত স্বরের সুরও তেমনই গীতকে মূর্ছনায় ভরাইয়া তোলে। এই গীত ও কাব্যের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান ও মাধুর্যদান করিতে ছন্দের সৃষ্টি হয়। গীত ব্যতিরেকে ছন্দের মাঝে বাক্যের শব্দার্থে মনুষ্যচিত্ত উদ্বেলিত হইতে সমর্থ হইলেও অর্থযুক্ত শব্দে সুর সংযোজিত হওয়ায় বাক্য অধিকতর গভীর ভাবসুলভ তাৎপর্য লাভ করে। এখানেই গীতিকাব্যের সার্থকতা। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যে গীতি-কাব্যের রূপ-লক্ষণের সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে বিদগ্ধজনদের মধ্যে মতানৈক্য থাকিলেও পূর্বেকার যুগের কাব্যগুলির আঙ্গিকগত রূপের বিকাশে অনেকেই একমত হইয়াছেন যে সুরবৈচিত্র্যের অভাব সত্ত্বেও কাব্যাংশগুলি একপ্রকার সুরের কাঠামোয় পরিবেশিত হইত।

---

১. বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি—ড. ক্ষুদিরাম দাস, পৃঃ ১২, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৬—১৯৭৯।

প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারায় দেখা যায় যে বৈদিক সূক্তগুলি ত্রিষ্টুভ, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুভ, বিরাজ ইত্যাদি নানা ছন্দে রচিত হইলেও সেগুলি কখনই পাঠ করিয়া শোনান হইত না, গান করিয়া শোনান হইত।[১] উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত-নানা পাঠভঙ্গি অর্থাৎ গীতিভঙ্গি সেখানে ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃত কাব্যগুলিও গান গাহিয়া শোনান হইত বা নাটক আকারে অভিনীত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লিখিয়াছেন মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নূপুর ও চামর সহযোগে একাকী বা দলবদ্ধভাবে সকল কাব্য কবিতাই গীত হইত। এই গীত ভাবধারা বাংলাদেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

বর্তমান আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের পটভূমি যে সঙ্গীতের আশ্রয়ে গঠিত তার এক বিস্তারিত রূপ পরিবেশনের প্রচেষ্টা লওয়া হইয়াছে। এই আলোচনার পূর্বার্ধে বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে কারণ ভাষাই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ।

বাংলা ভাষার মূল প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ভাষা এবং এই ভাষা খৃষ্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দ হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব প্রত্যন্তে তীব্বত চীনিয় গোষ্ঠীর ভাষা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রত্যন্তে অষ্ট্রিক ভাষা প্রচলিত ছিল।

বাংলাদেশের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ছিল বলিয়াও জানা যায়। রাজমহল পাহাড়ের দুর্গম অংশে মালতো মালপাহাড়ী ভাষা এবং মিথিলায় কর্ণাট রাজবংশীয়দের মধ্যে (সেন বংশ) কানাড়ী ভাষার প্রচলন ছিল।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে পূর্বাঞ্চলে 'কথ্য সংস্কৃত' কালক্রমে প্রাচ্য-প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রাচ্য অবহট্‌ঠ রূপে প্রকাশ পায়। উত্তরাপথের বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত ভাষা মিশ্রণ করিয়া 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' নামক এক ধরণের ভাষার প্রচলন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে গদ্য-পদ্যে রচিত 'ললিত বিস্তর' নামক বুদ্ধের জীবনীকাব্য এই ভাষায় রচিত বলিয়া জানা যায়। ইহাতে গাথা, গান, নৃত্য ও বাদ্য যন্ত্রাদির নামোল্লেখ রহিয়াছে। এই ভাষা কথ্য ভাষাকেও (অপভ্রংশ) প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। আধা সংস্কৃত ও আধা প্রাকৃত লইয়া গঠিত এই ভাষাটি সাধারণের বোধগম্য ছিল। স্বয়ং বুদ্ধ শাক্যবংশীয় এবং তীব্বত-চীনিয় ভাষী ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ উত্তরাপথের সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। অবহট্‌ঠের ভাঙ্গা পদ্ধতি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া

১. চর্যাপদ—অতীন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, চর্যাপদ পরিচয়ের অংশ, পৃঃ ১৮।

ব্রজবুলি ভাষায় উত্তমরূপে পরিগণিত হয়। ক্রমবিবর্তনের ফলে নানান দেশে নানান আবহাওয়ায় ভাষার পরিবর্তিত রূপ বিশেষ উল্লেখ্য।

অক্ষরলিপি ও ভাষার দ্বারা সাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। মহীপালের বাণগড়া লিপিতে (১০ শতক) সর্বপ্রথম বাংলালিপির স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ১১ শতকে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। গয়া হইতে পূর্বভারতের সমগ্র অঞ্চল বাংলা লিপির অধিকারভুক্ত হয়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রত্যন্তে সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রিক ভাষীগণও ক্রমশঃ আর্যভাষা ও সংস্কৃতি মানিয়া বাঙ্গালী নামে পরিগণিত হইলেন। বাংলার মাঝে দ্রাবিড়ভাষীও পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে তাহাদের বাস। কয়েকটি দ্রাবিড় শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের পূর্বে ভারতের পূর্বাঞ্চলে কথ্য-সংস্কৃত ক্রমে প্রাচ্য প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়। এইরূপে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রাচ্য অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ প্রাচ্য-অবহট্‌ঠ। আনুমাণিক ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পশ্চিমে বিহারী, উত্তর-পশ্চিমে মৈথিলী এবং পূর্বে বাংলা-উড়িয়া নামে আর্য ভাষায় পরিণত হয় এবং কালক্রমে ভোজপুরী ও মাগধী ভাষা উৎপন্ন হয়। ষোড়শ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃতের মাধ্যমেই কবিতা, নাটক প্রকাশিত হইত। পূর্বে প্রাকৃতে প্রধানতঃ অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ও কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। পর্বতের নিকটস্থ সমতলে অর্থাৎ বিহার, বাংলার গঙ্গা বিধৌত উপত্যকার প্রাচীন ধারাকে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে আসুর ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্যভাষীয় সমাজে রীতি দুইভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রাম্য ও ব্রাত্য। শাক্য, বজ্জি, লিচ্ছবি ব্রাত্য বলিয়া কথিত। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে অসুর ভাষা বলা হইয়াছে।

ভাষা হইতেই সাহিত্যের প্রকাশ। সাহিত্য চিরদিনই বিভিন্ন গতিপথে লীলায়িত। আলোচ্য কাব্যাংশগুলি ক্ষেত্রবিশেষে বীরাত্মক, প্রণয়াত্মক, ধর্মাত্মক, লৌকিক কথকতা, সামাজিকতা আবার কখনও সঙ্গীতরসে নিমজ্জিত। কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গেয়কাব্য ও পাঠকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে ছোট ছোট শ্লোক ব্যতীত গীতিকবিতা দুর্লভ। বৈদিক সাহিত্যে শ্লোকগুলিকে গাথা অর্থাৎ স্তুতি গান বলা হইত। মন্ত্র, গাথা, স্তুতি, আর্যগীত কালক্রমে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হইয়া ভারতে কাব্যাশ্রয়ী সঙ্গীত বিকশিত হইয়াছে।

মঙ্গল শব্দটি গৃহ কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৈদিককাল হইতেই বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্রী আচারের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে 'মঙ্গল গান' গাওয়া হইত। "সূর্যয়া ভদ্রামিদ বাসো গাথয়ৈতি পরিস্কৃতম্"—ঋক্‌বেদের উক্ত মন্ত্র হইতে জানা যায় যে কন্যার বসন-পাট করিবার সময় এই গান করা হইত। অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে গাথা অর্থাৎ গানের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।

"তস্মাদ বিবাহে গাথা গীয়তে"—মহাভারতের গ্রন্থকার ব্যস বলিয়াছেন—সূত, মাগধ বন্দিগণ রাজাধিপতির মঙ্গল তথা কল্যাণ কামনার্থে মঙ্গলগীতি করিতেন। ইহার দ্বারা তৎকালীন বীরশ্রেষ্ঠদের বিজয়গাঁথাও জ্ঞাপন করা হইত।

গৌরতন্ত্রের[১] প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তীব্বতীয় অভিযান শুরু হয়। এই সময় কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার পৌত্র জয়োপীরের বিরচিত 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে ভরত মতানুযায়ী তৎকালীন উচ্চাঙ্গ নৃত্যগীতের বিষয় এবং দেবদাসীদের সম্বন্ধেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন ব্রাহ্ম ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাংলাদেশে শুরু হয়। এই শতকের লিপিগুলির অলংকারময়তা কাব্যরীতিকে যথেষ্ট রসাল করিয়া তোলে। যুগোপযোগী সাহিত্যের মান নির্ণয়ে ব্যাকরণের বলিষ্ঠতার প্রয়োজন, সেই যুগের পাণিণির বৈয়াকরণ শাস্ত্র বর্তমান যুগকেও প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে। চান্দ্র ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা বরেন্দ্র নিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রগোমীর সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বে রচিত কিছু কাব্য ও নাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বৌদ্ধ বজ্রজানী ও শৈব নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যগণ অবহট্‌ঠ ভাষায় শিক্ষাপ্রদ কড়চা পুস্তক ও ছড়া গান রচনা করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে কান্যকুব্জ যশোবর্মার সভাকবি বাক্‌পতিরাজ বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় 'গউডবহো' নামক তৎকালীন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাহিনীযুক্ত একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে এই সময় গৌড়ি-রীতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তৃতি সকল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন আঙ্গিকের সূত্রপাত হয়।[২] বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডীর সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় যে সর্বভারত গ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতির পাশাপাশি গৌড়ি রীতি বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন

---

১. প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত—রাজ্যেশ্বর মিত্র, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১।

২. বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৬০, আদিপর্ব, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৬।

হইয়া ওঠে। সুতরাং প্রাচীন বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে গৌড়তন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ক্রমশঃ স্বাতন্ত্রতা অর্জন করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাল সাম্রাজ্য ও পাল বংশের সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চা বিশেষ সমাদৃত হয়। এই বংশের রাজা দেবপাল শিল্প, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, রামায়ণ, মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, নীতিবর্মার কীচক বধ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী রচয়িতাগণের সহায়তায় রচিত হয়। পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী সন্ধ্যাকর নন্দীর আর্যাছন্দে রচিত 'রামচরিত' নামক কাব্যে তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐ সকল স্থানে অবস্থিত গ্রন্থশালাগুলি পালযুগের শিক্ষা সংস্কৃতির জ্বলন্ত নিদর্শন। রামপাল 'রামাবতী' নামক একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরী সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পালযুগে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বহির্দেশের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বিভিন্ন অপ্রচলিত রাগ ও প্রবন্ধাদি এই সময় হইতে বাংলায় বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়।

সম্ভবতঃ দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 'চর্যাগীতিকা' বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সূচনাকাল নির্দেশ করে।[১] বাংলা ১৩২৩ সালে শ্রাবণমাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে সংগৃহীত অপভ্রংশ 'দোহাবলী' ও 'চর্যাগীতিকা' হাজার বছরের পুরাণো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা নামে প্রকাশিত করেন। ইহার মাধ্যমে বাংলা ভাষার আদিম রূপ ও পাল যুগে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

সাধনতত্ত্ব-জ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম অনুভূতি পরিচায়ক চর্যাগীতি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়। চর্যাপদগুলি অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক হইলেও ইহাতে চিত্রসৃষ্টি, প্রতীকদ্যোতনা, শব্দচয়ন কৌশল ও আবেগের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রধান রচনাকার হিসাবে লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, শবরীপাদ, শান্তিপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। চর্যায় 'বঙ্গাল' অপেক্ষা রাঢ় অঞ্চলের ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। চর্যাগীতি অর্ধসাঙ্কেতিক ও রাগাত্মিকা, পদাবলী সম্পূর্ণ সাঙ্কেতিক। ইহাতে নারী সঙ্গিনী গ্রহণের কথা অর্থাৎ

১. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাধারণ নরনারীর দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক প্রকটিত হইয়াছে। চর্যাগীতিকাকে বিশুদ্ধ কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত করা সমীচীন হইবে না, কারণ ধর্মীয় চেতনা মানুষের মনে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই চর্যাগীতিকারগণ বাক্যমিশ্রিত এক ধরণের গীতির আশ্রয় লইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেন বংশের রাজত্বকালের সূচনা হয়। সেন বংশীয়গণ সংস্কৃত চর্চার অনুরাগী ছিলেন। 'চিকিৎসা সংগ্রহ' রচয়িতা চক্রপানী দত্ত ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ এবং শ্রীকর ছিলেন সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থের রচয়িতা। জীমূতবাহন ও শ্রীধর ভট্ট তাঁহাদের রচনার দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কিত এক নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছিলেন। সেনরাজ বল্লাল সেন 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ', গোবর্ধনের 'আর্যা সপ্তশতী', ধোয়ীর 'পবনদূত', উমাপতি ধর এবং শরণের লিখিত বহু প্রকীর্ণ কবিতা সেই যুগের বাণী শিল্পের পরিচয় বহন করে।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সেই যুগের লৌকিক সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃতে সংস্করণ করিয়া দেবভাষায় অভিনব কবিতার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। তিনি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার আদি কবি রূপে বন্দিত। তাঁহার গীতিকবিতার আদর্শেই বাংলা দেশে, মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ও অনুরূপ গীতি কবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল। জয়দেব রচিত গানের ভাষা সংস্কৃত হইলেও এই ভাষা প্রাকৃত (অপভ্রংশ—অবহট্ঠ) ভাষার আদলে গঠিত। ছন্দের অভিনবত্ব জয়দেবের কাব্যগুলিকে বিশেষ ভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। নিম্ন প্রকারে তাঁহার রচিত একছত্রের শ্লোক পাঠককুলকে বিস্মিত করিয়া তোলে।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।[১]

কবি জয়দেব প্রাকৃত ভাষার ছায়াবহ সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে চব্বিশটি সংস্কৃত পদ, অল্পসংখ্যক প্রাসঙ্গিক শ্লোক সম্ভার রহিয়াছে। দ্বাদশ সর্গাত্মক এই মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনিঝংকার।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৬।

সুললিত গীতগোবিন্দের গান পঞ্চধাতু ও ছয় অঙ্গযুক্ত মেদিনীজাতির অন্তর্গত। ইহার প্রথম অংশ বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনা এবং অপর অংশে রাধাবিরহের কাহিনী রূপায়িত; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এড়াইয়া অন্য গোপীগণ সহ মত্ত হওয়ায় শ্রীরাধার মান, ভৎর্সিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নিবেদন এবং সখী দূতীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলনই গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু। গীতগোবিন্দ পদাবলীর পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সর্বরসের শিরোমণি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলামাধুর্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লীলাসুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের পদমাধুর্য অর্থাৎ ভাব ও কাব্য সম্পদ কবি জয়দেবকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। চর্যাগীতি অপেক্ষা গীতগোবিন্দের কলাচাতুর্য ও সাহিত্যের আঙ্গিক প্রসারতা অধিক বিস্তৃত। 'গীতগোবিন্দ' সম্ভবতঃ দল বাঁধিয়া গাওয়া হইত। দশাবতার বন্দনার পর মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে—

'শ্রী জয়দেব কবেরিদং কুরুতে মূদম্ মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি'

অর্থাৎ কবি ইহাকে 'মঙ্গলগীতি' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থ হইতে জানা যায় পদ্মাবতী ও জয়দেব উত্তম মার্জিত সঙ্গীতের চর্চা করিতেন। গীতগোবিন্দে রাগ-রাগিনী ও তালের নামোল্লেখ আছে, ইহা আখ্যানমূলক, সঙ্গীতভিত্তিক এবং নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থের মাধ্যমে চণ্ডীপূজা ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যে নির্দেশিত।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে মুসলমান শৌর্যের সূত্রপাতে দেশব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি হওয়া সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালী সুবশিল্পীগণ স্বীকৃত না হওয়ায় বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ক্রমশ খর্ব হইতে লাগিল, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনায় বাংলাদেশে ক্রমশঃ শান্তি স্থাপিত হয় এবং শাসনকার্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সুযোগ্য বাঙ্গালীগণ অলংকৃত করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য রূপ ও সনাতন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত দুই-চারিটি ছড়া এবং কয়েকটি গান ব্যতীত বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই এবং উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর কোন কাব্য বা নাটক রচনা সম্পর্কেও জানা যায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণবাণ বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। গ্রামীণ যে সকল স্থানে রাজনৈতিক আবর্ত ভয়ংকর পঙ্কিল হইয়া ওঠে নাই সেইস্থানে ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই সময় দেবদেবীর মাহাত্ম্য তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত—আখ্যায়িকা, গীতির মধ্যে উপদেশ এবং কবিতা, দ্বিতীয়তে রাজাশ্রয়ে শিক্ষিতগণের দ্বারা রচিত পুরাণ কাহিনী, কাব্য, নাটক, প্রকীর্ণ কবিতা, দরবারী ও বৈঠকী গান এবং তৃতীয়তে জনসাধারণের মাহাত্ম্যমূলক গেয় পাঞ্চালিকা কাব্য। ছোট ছোট গান মেয়েলী ব্রতে, গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য উৎসবে, দেবপূজার, গ্রাম্যদেবতার বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠানে এবং পুত্র-কন্যার জন্ম ও বিবাহে গাওয়া হইত।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে শমসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাঙ্গলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত হয় এবং এই ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে দেশে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস আরম্ভ হয়।

সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক বিখ্যাত গীতিনাট্যমূলক গ্রন্থখানি বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক আবিস্কৃত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। গান ও নাটকীয় পদগুলি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ সম্ভারে গ্রন্থটির কাব্যগত বিষয়গুলি পরিস্ফুট। 'ঝুমুর' শ্রেণীর গান সম্বলিত এই গ্রন্থে ছন্দবৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। ভাগবত পুরাণাদি হইতে উপকরণ আহ্বানে ও কবির স্বকপোল কল্পিত চিন্তাধারা সম্বলিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' আখ্যায়িকা কাব্য, কিন্তু আখ্যানকাব্যের মাঝে গীতিকাব্যের সুরও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও তালেরও উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালের পাঞ্চালী কাব্যের নাট্যগীতি শ্রেণীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পড়ে। এই গ্রন্থ গীতগোবিন্দের ধরণের চিত্রনাটগীতি। এখানে পাত্রপাত্রী তিনজন—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি (দূতী সখী) যেন যমপটের বা পুতুল নাচের তিনটি ছবি বা পুতুল। যেখানে পুতুল নাচাইতে বা ছবি দেখাইতে হইবে সেখানে "চিত্রকং" বলিয়া নির্দেশ আছে।[১]

এই কাব্যের গানগুলি শ্লোকমালিকায় কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। সম্ভবতঃ এই ধরণের পদ্ধতি পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যের ভাব ও ভাষা আদিরসাত্মক। মধ্যযুগে নৃত্যগীত ও আঙ্গিক বাচিক অভিনয় সাধারণতঃ নাটগীত বা গীতিনাট্য বলিয়া কথিত। 'নাট' বলিতে সম্পূর্ণ নাটক হিসাবে মনে করা হইত না। নৃত্যগীতযুক্ত গান যাহাতে গানেরই প্রাধান্য সেখানে নৃত্য গৌণ বা গানযুক্ত নৃত্য যেখানে নৃত্যই প্রধান সেখানে স্বল্পসংখ্যক গান করা হইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'নাটগীত' শব্দটি নৃত্যযুক্ত গান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' 'নাট' শব্দটি নৃত্য বা নৃত্যগীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অভিনয় বা যাত্রাভিনয় অর্থে নয়। কাব্যটির

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৫৮।

ভাষায় বাঁকুড়া, মানভূম, ধলভূম অঞ্চলের কথ্যভাষা ও উড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান এবং পদস্থ রাজকর্মচারীগণের উৎসাহে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিরসে বাংলা সাহিত্য এক অপূর্ব সিঞ্চনে সিক্ত হইয়া ওঠে। অনুবাদ সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা মূলক এক জাতীয় পাঁচালী কাব্য। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণ কাহিনীগুলি অনুবাদ সাহিত্যের মূল উৎস। অনুবাদ সাহিত্য পাঁচালী সাহিত্যের ন্যায় এবং ব্রত, পূজা ও অন্যান্য উৎসবে রচিত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত গেয় কাব্য বিশেষ।

কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি রচয়িতাগণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহাকবি কৃত্তিবাসের "শ্রীরাম পাঁচালী" সম্ভবতঃ প্রথম অনুবাদ সাহিত্য। ভাগবতের অনুবাদ বা মালাধর বসুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দের 'কৃষ্ণমঙ্গল', দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রঘুপণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী' প্রভৃতি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় প্রেমিকমূর্তি প্রকাশ পায়।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীকাল দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যান কাব্যকে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক ব্রতকথা এবং পাঁচালীগানের বিবর্তন ধারায় বাঙ্গালী জাতির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, আচার ও ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল প্রধান। ইহা ব্যতীত সূর্যমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল ইত্যাদি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ব্যতীত চৈতন্য ভাগবত ও 'চৈতন্যমঙ্গল' বৈষ্ণবধারা অবলম্বনে রচিত। বহু রাগরাগিনীর উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া গেলেও স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে এগুলি গীত হইত না। মঙ্গলসূচক এই গীত রাগের কাঠামোয় আবৃত্তির সুরে গাওয়া হইয়া থাকে এবং ইহার ছন্দ বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসাকে লইয়া নানারূপ মাহাত্ম্য ও রূপকথা বিষয়ক একপ্রকার কাব্যগীতি দল বাঁধিয়া গাহিবার রীতি প্রচারিত হইতে থাকে। এই গীতগুলি 'মনসামঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়।

এই কাব্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; পশ্চিমবঙ্গীয়, উত্তরাঙ্গ অসমীয় এবং পূর্ববঙ্গীয়। মনসামঙ্গল গীত মনসা পূজার অঙ্গরূপে পূজিত।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৭০।

গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের যুগে বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' নামক একখানি কাব্য ছিল। তাহাতে দেবতা গণেশ, ধর্ম ও নারায়ণের বন্দনার পর সর্বাঙ্গে সর্পালংকার ভূষিতা মনসার রাজবেশ ও সভার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল' পাঞ্চালীতে চণ্ডীদেবীর মহিমা গীত পাওয়া যায়, ইহাতে দুইটি খণ্ড—আখেটিক ও বণিক। মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে 'চণ্ডীমঙ্গল' পাঠের সঙ্গে সারারাত ধরিয়া গীত হয়। মাধবানন্দের 'সারদাচরিতে' কয়েকটি ভাল ধুয়া ও পদ রহিয়াছে।

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী ভাবে, রসে ও কল্পনায় নূতন বিবর্তিতরূপে প্রভাবিত হইয়াছে। ঈশ্বরত্ব ও জীবনবোধ সম্পর্কে প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচিত পদসমূহ প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীর নিদর্শন এবং ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসের রচিত পদ চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। নরহরি চক্রবর্তী, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বলরাম দাস চৈতন্য প্রবর্তিত নূতন ধর্মালোকে পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেব তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক বিশেষ আঙ্গিকে 'গৌরচন্দ্রিকা' পদ সাহিত্য রচনা প্রেরণা স্বরূপ হইয়া ওঠে।

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ভনিতা। এই ভনিতার জন্য কোন কোন কবির পদ সম্পূর্ণ নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং এক অভাবিত ব্যঞ্জনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কবিগণ সেখানে লীলাসঙ্গী। এই নিত্য-পরিবর্তনশীল জগৎ এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মর্মমূলে যে শাশ্বত সত্য চির স্থির রহিয়াছে আত্মগত ভাবতন্ময়তায় সেই রসস্বরূপ ও মহাভাবময়ীর দিব্যানুভূতি বৈষ্ণব কবিগণকে এই সৌভাগ্যদান করিয়াছে। সাহিত্যের রসের সঙ্গে যোগী জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত প্রতিপাদ্য রসের মিলনেই বৈষ্ণব পদাবলী চিরন্তন আস্বাদ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম পূর্বক যুগ হইতে যুগান্তরের পথে পদাবলী তাই নিত্য নূতন পথচারীকে আকর্ষণ করিতেছে।[১]

১। বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। প্রকাশ—সংশোধিত সংস্করণ—১৯৮০, পৃঃ ভূমিকা—১৩

ষোড়শ শতাব্দী বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত। বলরাম দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দ মিশ্রের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের অপরূপ কীর্তি হিসাবে পরিগণিত। বৃন্দাবন দাস তিনখণ্ডে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' নামক একখানি কাব্য আবৃত্তি ও গান করিবার উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহু জান
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥"

ইহাতে উল্লিখিত 'ধুয়া' গান (গীতিকবিতার টুকরা) বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে। 'ধুয়া' ধ্রুবা শব্দের অপভ্রংশ। গীতের যে অংশ বারবার গীত হয় তাহাকেই ধ্রুবা বা ধুয়া বলা হয়।

(জাতীয় সঙ্গীতে 'জয় হে' এই অংশটি ধুয়া)। মধ্য ও পূর্ববঙ্গে 'ধুয়া গান' বলিতে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বিষয়ক ছড়া।

বৃন্দাবন দাসের রচিত 'পদকল্পতরু' এবং 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' নামক দুইখানি সঙ্গীতবহুল কাব্যও আকর্ষণীয়। কাব্যগুলি বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার স্নিগ্ধতায় উৎসর্গীকৃত।

চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক কাব্যখানিতে 'ব্রজবুলি' পদের ব্যবহার অধিক এবং ইহাতে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। 'গৌরাঙ্গ বিজয়ের একটি পদ—

"আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কহিব
গৌরাঙ্গ বিজয় তিন খণ্ডে পূর্ণ হৈব।
গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদি খণ্ড পুঁথি
বৈষ্ণব চরণে কিছু করিমু প্রণতি ॥

গৌরাধিপতি হোসেন শাহের রূপ নামক জনৈক কর্মচারী মন্ত্রী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য, গীতিকা এবং ব্রজবুলি ভাষায় হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, গীতাবলী, দানকেলী কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, 'ধর্মমঙ্গলা', 'মনসা বিজয়' প্রভৃতি গেয় কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর পদে গৌরী, গান্ধার প্রভৃতি রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

রূপ গোস্বামীর পদ—

[1]ইষ্টভজন বল্লভজন
চিত্ত কমলবর
গোপ যুবতী খণ্ডলমতি

---

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

মোহন কলগীতি,
মন্ত্ত সকল কৃত্যাবিকল
যৌবন পরিবীত।

নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় নিম্নলিখিত পদটি উল্লেখযোগ্য।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান
হেন নরহরি সঙ্গ পাণ্ডা পঙ্গশ্রী গৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত", 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ।

উদাহরণস্বরূপ—

"শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপশ্রীরূপ সেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথ দাস কৃতিনা শ্রীজীব সঙ্গোদগতে,
কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দ লীলামৃতে
স্বর্গো হয়ং রজনী বিলাস বলিত পূর্ণস্ত্রয়ো বিংশক ॥"

গোবিন্দ লীলামৃত।

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

উক্ত পংক্তি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বন্দনা গীতি হিসাবে বর্ণিত। এই সময় শ্যামদাস 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'গোবিন্দ মঙ্গল', ও চণ্ডীর উপাখ্যানবিশিষ্ট পাঞ্চালী কাব্যগীতি রচনা করিয়াছিলেন।

ব্রজবুলি ভাষায় গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় মুখরিত নাটক 'সঙ্গীত মাধবে'র গানগুলি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত গান হিসাবে রচিত।

[1] কানু উপেখি রাই লেখই মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম পরিবেশ করি সো হরি আয়ল সহচরী সাথ
শুন স্বজনী কি ফল মানিনি মানে।

১. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সঙ্গীত—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

চীট কানাই কতহু ভঙ্গি জানত কো করু কত অবধানে
শমরি হেরি রাই সখি পুছত, সো কহু ব্রজনব রামা।
তুয়া সখী হোত যতনে চলি আইলি কোরে কর ইহ শামা
করতহি কোর পরশ সাধ্ব জননল, কাহুকে কপল বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাস।"

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু রামানন্দ রায় নামক এক রাজকর্মচারী জয়দেবের অনুকরণে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে একুশটি গানের মধ্যে একটি গান কর্ণাট রাগে গেয় বলিয়া উল্লিখিত। রামানন্দ রায়ের পদগানে নাটিকা তোড়ী প্রভৃতি রাগের নামোল্লেখ রহিয়াছে। 'জগন্নাথবল্লভে'র নিম্নলিখিত পদটি বর্তমানেও জনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

"কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্
পংকজ মিব মৃদু মারুত চলিতম্
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ সাধা
বিনিদধতী মৃদু মন্থর পাদং
রচয়তি কুঞ্জর গতিমনুবাদং
জনয়তুরুদ্র গজাধিপ মুদিনং
রামানন্দ রায় কবি গদিতম্ ॥"

কালক্রমে লোচনানন্দ দাস কর্তৃক উক্ত নাটকের অনুবাদ ও গানগুলির তর্জমা করা হয়। উপরি উল্লিখিত পদটিকে অনুসরণ করিয়া লোচনানন্দ রচনা করিয়াছেন।

চলিল ব্রজমোহিনী ধনী কুঞ্জর বর গমনী,
কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ রমণী।
মদন আতঙ্গে পুলক অঙ্গ অব অনুরাগে প্রেম তরঙ্গ
চঞ্চল মৃগনয়নী।
কবরী-মণ্ডিত মালতী-মাল, নব জলধরে তড়িত জাল
স্থকিত চকিত অমনি
বদন মণ্ডল শারদচন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দ,
নিখিল ভুবন মোহিনী॥
নীলবসন রতন ভূষণ, মনিময় হার দোলয়ে সঘন,
কটি তটে বাজে কিংকনী।

চরণ কমলে মাতলভৃঙ্গ, মধুপান করি ছাড়ে না সঙ্গ
সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি।
চকিতযুগল নয়নপদ্ম, খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ,
চম্পক কাঞ্চন বরণী
হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরী সঙ্গে
লোচন মনরঞ্জনী ॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গেয় কাব্যখানিও এই সময়কালীন রচনা।

[১] জয়ানন্দ আশির্ব্বাদ করহ বিশেষে
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাহে দেশে দেশে।
জয়ানন্দ আশির্ব্বাদ করহ হরিষে
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাহে দেশে দেশে ॥

শ্রী চৈতন্যদেবের আদ্য অনুচরগণের মধ্যে একজন শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রথম পদাবলী রচয়িতা বলিয়া গণ্য। তাঁহার পদে পটমঞ্জরী, কামোদ, সুহে বা সুহা রাগের নামোল্লেখ দেখা যায়।

গদাধর অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে
রাধাভাব আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলান
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখ খানি,
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে
না জানি মুরারী গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বাংলার গৌরব কাশীরাম দাসের এই সময়কালীন 'ভারত পাচালী' রচনা বিশেষ অবদান স্বরূপ। সপ্তদশে পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের গানগুলি বিখ্যাত। ইহাতে ভূপালী, আশোয়ারী, ধানসী, কেদারিকা, মঙ্গল গুর্জরী, গান্ধার প্রভৃতি রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি পদাবলী সংগ্রহে ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্যের কয়েকটি গান 'মালব' রাগে বলিয়া নির্দেশিত :

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩৮৩, ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৭৮।

আদি রসাত্মক 'কৃষ্ণলীলা' গান এই সময়ে ঢমালী বা ধমালী নামে আখ্যায়িত ছিল। 'ঢামালী' শব্দ ঢেমন, ঢেমনা বা ডেমনী ইত্যাদি সম্পৃক্ত। (অর্থাৎ ব্যভিচার বা ব্যভিচারিণী) কোনও শব্দের সাদৃশ্যে আদি 'ঢ'-কার 'ধ'-কারে পরিণত হইয়া ধামালী হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ 'ধামালী' শব্দটি বাদ্য পদ্ধতি বা গীত পদ্ধতি হওয়া অসম্ভব নয় অর্থাৎ ধামার হইতেও আসিতে পারে। পুনরায় প্রাচীন রাজস্থানীতে একজাতীয় কবিতাকে 'ঢমাল' বলিয়া জানা যায়। শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা জিলায় মেয়েলী নৃত্যের শ্রেণী বিশেষ। এই উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত গানকে 'ধামাইল' বলা হয়।

'কৃষ্ণ ধামাইল' রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রাম্য ভাবাপন্ন কৃষ্ণযাত্রা নাটগীতির প্রকার বিশেষকে কৃষ্ণ ধামাইল বলা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কৃষ্ণ ধামালি অনুসরণে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচন দাস সর্বপ্রথম ধামালিকে গ্রাম্য ভাবাপন্ন হইতে মুক্ত করিয়া 'বৈষ্ণব পদাবলী'র আভ্যন্তরিণ রসসঞ্চারে সিঞ্চিত করিবার প্রয়াসী হন।

নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পূর্বে ''শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি উল্লেখযোগ্য।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিনীরাগে
ব্রজরস করিলেন গান
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞ্চাল পঙ্গশ্রী গৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সূচনা হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ এক নূতন ধারা আনিতে সচেষ্ট হন। লৌকিক ঘটনা অবলম্বনে গৌড় দরবার ও রোসাঙ রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া কিছু সাহিত্য পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ অঞ্চলে এবং লোকসাহিত্যরূপে কিছু গীতি সাহিত্য রচিত হয়। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি দৌলত কাজী'র 'লোরচন্দ্রানী' নামক একখানি অসমাপ্ত প্রণয়মূলক কাব্য পরবর্তীকালে আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি আলাওল কর্তৃক সম্পূর্ণতা লাভ করে। পদ্মাবতীকাব্য, ময়ফুল-মূলক বদিউজ্জমাল, হপ্তপয়কর, সেকেন্দ্র-নামা প্রভৃতি সামাজিক কাব্য এবং ধর্মাশ্রিত করিয়া তোহফা, নবীবংশ প্রভৃতি

কাব্য আলাওল রচনা করিয়াছিলেন। আলাওল সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন[১]।

সপ্তদশে পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক গ্রন্থের গানগুলি বিশেষ বিখ্যাত। ইহাতে ভূপালী, আশোয়ারী, ধানসী, কেদারিকা, মঙ্গল গুর্জরী, গান্ধার প্রভৃতি রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সপ্তদশের শেষে বাসুদেব ঘোষের পদ রচনায় বরাড়ী, জয়জয়ন্তী, ভূপালী, গান্ধার ও মায়ুর রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপরাম চক্রবর্তী সংসার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গাহিতেন।

শ্রী ধর্মমঙ্গল গীত শুন সর্বজন
গায় গীত রূপরাম দৈবকীনন্দন ॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'গীতচিন্তামণি' অথবা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' প্রাচীনতম পদ সংগ্রহ ও সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'চমৎকার চন্দ্রিকা' নামক হাস্যরসাত্মক কাব্যের 'মঞ্জুষিকা মিলন' নামক ভাগটি ছত্রিশটি শ্লোকে গ্রথিত, ইহা অদ্যাবধি কীর্তনিয়াগণ পালা পর্যায়ে গাহিয়া থাকেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া জানা যায়। গোবিন্দ দাস ও কৃষ্ণরাম দাস 'বিদ্যাসুন্দর' নামক একটি প্রণয় কাব্য, পিলিরাম আচার্যের 'কালিকা মঙ্গল', মুক্তারাম সেন সরল ভাষায় 'সারদা মঙ্গল' নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবানীশংকর দাস রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ভক্তিমূলক পদ সন্নিবেশ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, হরিশ্চন্দ্র বসু মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গা সপ্তশতী

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ—১৩৮৫, পৃঃ ৩৯৫ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমরেন্দ্র লাহিড়ী।

অবলম্বনে চণ্ডী বিজয় বা দেবীমঙ্গল, জয় নারায়ণ রায় চণ্ডীমঙ্গল এবং সত্যপীর অবলম্বনে 'হরিলীলা' নামক অলংকৃত কাব্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ ও দ্বিজ কমলাকান্তের 'গঙ্গামঙ্গল', শঙ্করাচার্যের গঙ্গার পাঁচালী নামক 'বিষ্ণু পদতীর্থমালা কাব্য', রামজীবন বিদ্যাভূষণের 'সূর্যমঙ্গল' কাব্য, সহদেব চক্রবর্তী নাথযোগীদের উপাখ্যান লইয়া ধর্ম বা অনিলপুরাণ, বিজয়রাম সেন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বর্ণনাসহ তীর্থমঙ্গল নামক কাব্য, গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদসাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ না করিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'পালাকীর্তন' ও বিভিন্ন পদ সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়। গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ, কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ১৭৩০ সালে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত' সংকলনে নূতন রীতির গীতি কবিতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরই সর্বপ্রথম পদগুলির অন্তে রাগের ধ্যানমূর্তি সংযোজিত করিয়াছেন।

[1]আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ
করতলে করই বয়ন অবলম্ব
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছল ছল নয়ন—কমল—সুবিলাস,
নব নব ভাব করত পরকাশ।
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ
রাধামোহন কছু না পাওল থেহু॥

কবিশেখর রায় এই সময় 'কৃত্তনামৃত' এবং 'গোপীনাথ বিজয়' নামে গেয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

হেরলু গৌরকিশোর সুরধনী তীরে উজোর।
সুখর ভকত জন সঙ্গ করতঁহি কত কত রঙ্গ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস, কুন্দ কুমুদ পরকাশ।
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড, জীতল করিবর শুণ্ড॥
অহর্নিশি ভাবে বিভোর কুলকামিনী চিতচোর।

---

১. বৈষ্ণব পদাবলী—শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত পৃঃ ৫।

মন্দ মধুর গতি ভাতি মুরছিত মনমথ হাতী।
সোপদ পঙ্কজ রায়, কহ কবিশেখর রায় ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বরের শিব সংকীর্ত্তন গ্রন্থে 'ঢপ কীর্ত্তনের' সূত্রপাত হয়, বলা বাহুল্য ইহা কীর্ত্তন গানের একটি লৌকিক রূপ বিশেষ।

নরহরি চক্রবর্তীর (অপর নাম ঘনশ্যাম) রচিত 'সঙ্গীত সার সংগ্রহ', 'ভক্তি রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ আকর্ষণীয়। এই সকল গ্রন্থে সঙ্গীত বিষয়ে এবং তৎকালীন বৈষ্ণব আন্দোলন বিষয়ে বিশেষভাবে জানা যায়। তাঁহার রচিত 'নরোত্তমবিলাসে' শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ বিষয়ক কাহিনী লইয়া ছন্দ চাতুর্যের সহিত ব্রজবুলি পদ অবলম্বনে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। [১]নরহরি চক্রবর্তী "গীতচন্দ্রোদয়" নামক একখানি সুবৃহৎ পদাবলী সংকলন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাষায় প্রাকৃত পৈঙ্গলের অনুসারে বিচিত্র পদ রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

নাচত গৌর নিখিল নট পণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গি মদন মন হরই……
অতুল প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ
লে অই শরণ চরণতলে পড়ই।
নরহরি—পঁহুক কিরীতি রহু জগ ভরি
পরম দুলহ ধন নিয়ত বিতরই।

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 'শিবায়ন', দেবীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তাঁহার সত্যনারায়ণ ব্রতকথা পাঁচালী প্রথম রচনা। গীতিবহুল 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' এবং রসমঞ্জরীতে বৈষ্ণব কবির ভক্তি ও ভাব সময়োচিত বর্ণনা ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সন্নিবেশিত গানগুলি অসামান্য শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য হাস্য ও আদিরসাত্মক হইলেও তাঁহার রচিত ছোট ছোট কবিতা এবং সংস্কৃত ও বাংলায় 'নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক' বিশেষ উপভোগ্য। তাঁহার কাব্যে ছন্দের পারিপাট্য ছন্দের ঝংকার এবং অর্থের অলংকার অতীব কৌশলযুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজদরবার প্রভাবিত সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের অশ্লীলতাকে রচনার লালিত্য, ছন্দের ঝংকার ও বৈচিত্র্য কলুষিত করিবার কল্পে বিদ্যাসুন্দরের যুগধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট।

---

১. বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সঙ্গীত ও সাহিত্য। ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, পৃঃ ২০১, প্রকাশিত—১৯৬৮।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' এবং 'রসসার সঙ্গীত' নামক সঙ্গীত সম্বন্ধীয় দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' ও 'পদ্মপুরাণ' নামক আখ্যানকাব্যের বহু গান হৃদয়গ্রাহী।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় ভিন্ন প্রকারের বিশেষ মৌলিকপূর্ণ শাক্ত পদাবলী রচিত হয়। এই সাহিত্যমূলক সঙ্গীতের প্রধান স্বারী হইলেন রামপ্রসাদ সেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে প্রথমে তিনি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজস্ব সুর সংযোজনান্তে মায়ের মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের মাতৃবিশ্বাস গোষ্ঠীচেতনা লব্ধ জিনিষ নহে, জীবন জিজ্ঞাসাজনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টিপাথরে ইহার সারবত্তা বারংবার পরীক্ষিত হইয়াছে। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

> [১]আমি কি দুখেরে ডরাই
>
> দুখে দুখে জনম গেল, আর কত দুখ দাও দেখি তাই।

রামপ্রসাদ ছিলেন যুগের কবি। দুঃখ, দুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন না থাকিয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে দুঃখহারিণী শ্যামা মায়ের নিকট আর্তি বেদনা জানাইয়াছেন। হৃদয়ের সকল ভক্তি উৎসারিত করিয়া রামপ্রসাদী মাতৃসঙ্গীত আন্তরিকতার সারল্য ও মাধুর্যে জগতের সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদ 'কালীকীর্তনে' কালীকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের অনুরূপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। পুনরায় বাউল গানের ন্যায় দুঃখবাদের সঙ্গীতও তাঁহার রচনায় আকর্ষণীয়। শাক্ত পদাবলী দুইভাগে বিভক্ত। লীলাসঙ্গীত ও বিশুদ্ধ সাধন সঙ্গীত। তৎকালীন সময়ের সমাজ জীবনের বাস্তবরূপ শাক্ত পদাবলীর অন্যতম সঙ্গীত আগমনী ও বিজয়া গীতের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়। আনন্দরূপিনী 'মা' কে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া আর্তি বেদনা রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত গানে পরিস্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

> মা মা বলে আর ডাকবো না
>
> দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা
>
> ছিলাম গৃহবাসী
>
> করিলি সন্ন্যাসী

১. ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রকাশিত ১৩৮৭, পৃঃ ২২৯।

আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বোলে আর কোলে যাব না

শারদীয় দুর্গোৎসবই বাংলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব। যদিও ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অসুরনাশিনী দেবীর পূজা মহোৎসব, তথাপি এই পূজা এক বিশেষ মধুর রসাশ্রিত আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। উমা মায়ের স্বামীগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার পুত্রকন্যাদি সহ পিত্রালয়ে আগমনকে কেন্দ্র করিয়া রামপ্রসাদ আগমনী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না

তিনদিনব্যাপী পিতৃগৃহের উৎসব আনন্দ অন্তে পুনরায় আসে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন, ইহাকেই 'বিজয়া' বলা হয়। মায়ের সঙ্গ বিচ্ছেদের শিহরণে লিখিয়াছেন—

"ওরে নবমী নিশি না হইওরে অবসান।"

তদানীন্তনকালে সমপর্যায়ে আধ্যাত্মোনুভূতির প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায় সাধক কমলাকান্তের মধ্যে। ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপ সাধনতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপ সাধন বর্ণনা কমলাকান্তের সঙ্গীতেও পাওয়া যায়।

"মন পবনের নৌকা বটে
বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুবাতাসে বাদাম তোলে।
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল,
সুজনকুজন আছে যারা
তাঁদের দেরে দাঁরে ফেলে।"

পরম কারণের মাধ্যমে মহাকালী নারী ও পুরুষ উভয় রূপেই প্রকাশিত হয়। এই প্রকার অনুভবে সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

জান নাকি মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখনও কখনও পুরুষ হয়।

হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দনুজ তনয় করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

বাংলা সঙ্গীত ও সাহিত্য সর্বদাই একই বৃন্তে দুইটি ফুলের ন্যায় বিরাজমান। ক্রমবিবর্তনের ফলে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমেই সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি ধারা ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত উদ্ভূত। বিশেষ বিশেষ মানবিক রস ও অনুভূতি অনুসারে সঙ্গীতের শ্রেণী বিভাগ প্লাবিত।

সমাজে লিখিত সাহিত্য ধারার বহু পূর্বেই মৌখিক সাহিত্য ধারার প্রবাহ থাকিলেও বস্তুতঃ ইহার আরম্ভকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের তালে তালে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে এবং অলিখিত সাহিত্যও ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হইতে থাকে। ইহাই প্রকারান্তরে লোক সাহিত্যে পর্যায়ভুক্ত হয়। কখনও ইহা বাচনিক, কখনও গীতি-মূলক। 'ছড়া' শব্দের আক্ষরিক ও বিশ্লেষণাত্মক অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান। ছন্দোবদ্ধ গ্রাম্য উক্তি বা বাদ-প্রতিবাদ-মূলক গ্রাম্য কবিতাই সাধারণতঃ ছড়া হিসাবে রূপায়িত; সংস্কৃত ছটা প্রাকৃতে ছড়া শব্দটিই কালক্রমে বাংলায় 'ছড়া' নামে আখ্যায়িত। প্রাচীনকালে 'ছড়া'র প্রচলন থাকিলেও বর্তমান রূপ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। ছড়াগুলি পরম্পরের মুখে মুখে রচিত হইবার ফলে এক অনিয়মিত স্মৃতিনির্ভর সূচক আঙ্গিকে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের যুগে আর্যা শব্দটি 'ছড়া' অর্থে গৃহীত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ভাষায় বাংলাদেশের বৌদ্ধবজ্র যানিক ও শৈবনাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যগণ সন্ধ্যাভাষায় ধর্মবিষয়ক কিছু ছড়া গান রচনা করিয়াছেন; তৎকালীন অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত নীতিবাক্য, বহুদর্শীর উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা মূলক ছড়া কালক্রমে বাংলায় 'ডাক ও খনার বচন' নামক মৌখিক সাহিত্য রূপে উপস্থাপিত হয়। ইহাতে ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা সামাজিক উপদেশাবলীই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়।

ডাকের বচন— "বুদ্ধা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড
আগল নৈলে নির্বারিব তুণ্ড।"

প্রত্ন— নব্য—আর্য ভাষায় নানাবিধ গীতি রচনার মধ্যে চর্যা নামক অধ্যাত্ম-মূলক গান ও ছড়া জনপ্রিয় হইয়াছিল। তদানীন্তন কালের সিদ্ধাচার্যগণ

সুরের মাধ্যমে অনুন্নত জনসাধারণের নিমিত্ত সহজবোধ্য ভাষায় অধ্যাত্মমূলক ও সহজ সাধনতত্ত্ব সূচক বিচিত্র ছড়া সম্ভার প্রকাশ করিয়াছেন।

চর্যায় ছড়া (কাহ্নপাদ)

"আলি এ° কালি এ° বাটা রুন্ধেলা
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।"

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক গীতি কাব্যেও বিভিন্ন আদিরসাত্মক ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সময় হইতেই বিভিন্ন কাব্যে ধর্মীয় প্রভাবযুক্ত সম্পূর্ণ লোকায়িত ছড়ার প্রচলন ছিল।

গণিতের শিক্ষা— কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে ॥

প্রাকৃতপৈঙ্গল কাব্যাস্থিত ছড়ায় রস সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

সোমহ কন্তা
দূর দিগন্তা
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।

মনসা মঙ্গল—পদ্মার সর্পসজ্জা—কানা হরিদত্ত।

দুই হাতে শংখ হইল গরল শঙ্খিনী
কেশের গাত কৈল এ কালনাগিনী ॥

বিজয়গুপ্ত— গোটা কতক কচুর পাতা
সুমিত্রা গো মশামাছির মাথা ॥

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর চৈতন্যদেবের নিকট গোপনীয় সংবাদ প্রেরণে হেঁয়ালী ছড়ার আশ্রয় লইতেন বলিয়া জানা যায়।

বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

গোবিন্দদাস—

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ

ফুল্ল মল্লী মালতী-যূথী
মত্ত মধুপ ভোরনি ॥

লোচনদাস—আক্ষেপানুরাগ—

জ্বালার উপর জ্বালা সই
জ্বালার উপর জ্বালা
জলকে যাই পথ না পাই
বসন টানে কালা ॥

সেক শুভোদয়া—

শ্রীমল্লক্ষ্মণ—সেন মহাবীর
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর ॥

অভয়ামঙ্গল— মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর ॥

বারমতি—রূপরাম ঃ

ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥
কি করিব পান গুয়া শীতল চন্দন।
গৃহস্থের বাড়ী আমি যাই না কখন ॥

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায়

আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব
মেয়েগুলা মাথা কোরে তোরে রক্ত দিব ॥

শাক্তপদাবলী—রামপ্রসাদ সেন

ভূতলে থাকি মা গো
কল্লে আমায় লোহাপেটা
তবু আমি কালী বলে ডাকি
সাবাস আমার বুকের পাটা ॥

ছড়ার আঙ্গিকগত রূপের মাঝেই সম্ভবতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের মহীরূহ রূপ লুক্কায়িত ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত

ছিল বাক্‌নির্ভর, পদাশ্রিত।[১] বহু পুঁথিতে রাগ-রাগিণী বা সাঙ্গীতিক কোন রীতি পদ্ধতি না থাকার ফলে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে মধ্য যুগীয় বাংলাকাব্য মাত্রই সঙ্গীত নির্ভর নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেন—

চৈতন্য চরিতামৃত পড়িবার জন্য লেখা, গান করিবার জন্য নয়। তাই রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। তবে ত্রিপদী ছন্দে লেখা কাব্যরস সিক্ত অংশগুলি পাঠক ইচ্ছামত সুরে আবৃত্তি করিতে পারেন ইহা জানাইবার জন্য 'যথা রাগ' এই নির্দেশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ অ-গেয় গ্রন্থ।[২]

অপরপক্ষে বহু বৈষ্ণব—কড়চা গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায় যেগুলি গেয় হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই।[৩]

১. বাংলা কাব্য সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত—অরুণ কুমার বসু—পৃঃ ৩, (১৩৮৪)।

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন। (পূর্বার্ধ) পৃঃ ৩৩৯।

৩. মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি। (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা) প্রকাশ ১৯৮৫। পৃঃ ১৫২।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের গায়ন রীতি ধারা

প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতে প্রবন্ধ জাতীয় বহু গীতরূপ প্রচলিত ছিল। প্রবন্ধের রীতি বৈচিত্র্য সময়ের ক্রমবিবর্তনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গীতিকাব্যগুলি প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও ক্রমাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচনা করে। সঙ্গীতের যে অংশ গীত হয় প্রাচীন কলাকারেরা তার বাক্যাংশকেই প্রবন্ধ নামে অভিহিত করিতেন। সুতরাং আঞ্চলিক কাব্যের রূপভেদের জন্য প্রবন্ধভঙ্গির রূপভেদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার সঙ্গীতাশ্রিত কাব্যগুলির অন্তবর্তীরূপে সম্ভবতঃ সে কারণেই রীতি বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে গায়নরীতিতেও পার্থক্য সূচিত হয়।

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত গীতের প্রধান রূপকে গৌড়ীগীত বলা হইত। এই গীত গৌড়বাসীর নিকট বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। গৌড়ীগীতি তিনটি গ্রামরাগে আশ্রিত : গৌড়কৈশিক, গৌড়কৈশিক মধ্যম ও গৌড় পঞ্চম। কালক্রমে নানাবিধ মিশ্রণের ফলে গ্রামরাগগুলি ভাঙ্গিয়া ভাষারাগ, বিভাষারাগ ও অন্তর ভাষা রাগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত রূপকে ভাষা বলা হয়। গৌড়ী রীতি বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত বলিয়া আখ্যায়িত ছিল। রাগলক্ষণ দ্বারা এই গীতের বিচার করা হইত। গ্রামরাগ আলাপের পর এই গীতের আরম্ভ করা হইত।

চর্যাগীতিতে সর্বসমেত একান্নটি গানের মধ্যে সাড়ে ছেচাল্লিশটি গান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লুই, কুক্কুরী, শান্তি, দারিক, রহু, ভুশুকু এবং কাহ্নুর পদগুলি আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর। এই পদগুলিতে নরনারীর দাম্পত্য বা গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে, কাপালিক প্রেমলীলা, নারীসঙ্গিনীর কথা বর্ণিত। এই গীতিগুলি সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের 'রাগ তরঙ্গিনী' অথবা পরবর্তীকালে শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকরের' পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা এ বিষয়ে নানা মতানৈক্য রহিয়াছে। শার্ঙ্গদেব তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত রত্নাকরে' চর্যার গীত রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এ গানগুলি প্রকীর্ণ শ্রেণীর প্রবন্ধ গান। প্রতিটি গানের উপরে 'ধ্রু' এই কথাটি লিখিবার দরুণ অনেকে ধ্রুপদ

গায়ন পদ্ধতি হিসাবে মনে করেন। শার্ঙ্গদেব চর্যাগীতি সম্বন্ধে দুইটি শ্রেণীর নির্দেশ দিয়াছেন। যেখানে সমগ্র গীতি সম্মেলক হিসাবে গাওয়া হইত তাহাকে সমধ্রুবা এবং কেবলমাত্র ধ্রুব অংশ সম্মেলক ভাবে গাওয়া হইলে বিষম ধ্রুবা বলা হইত। প্রাচীন ধ্রুবপদ প্রবন্ধের গায়নভঙ্গি ছিল পাঁচ প্রকার—শুদ্ধা গীতি, ভিন্না গীতি, গৌড়ী গীতি, বেসরা গীতি এবং সাধারণী গীতি।

কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কাব্যের কোন অংশই সম্ভবতঃ এই পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না। সুতরাং অনুমান করা যায় যে প্রাচীন প্রবন্ধ গীতি গাইবার একটি দেশীয় লৌকিক বা আঞ্চলিক রূপ বাংলায় অর্থাৎ পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন চর্যাগীতি পদ্ধতি বা পঞ্ঝটিকা ছন্দে রচিত। পদান্ত মিল যুক্ত, দ্বিতীয় তালযুক্ত ও পূর্ণা জাতীয়।

চর্যাপদের গানগুলি বিভিন্ন রাগরাগিণীর দ্বারা নামাঙ্কিত। যথা—অরু, কহ্ন গুর্জরী, কামোদ, গউড়া, গবড়া, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধানসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, বলাড্ডী, ভৈরবী, মল্লারী, মালসী, রামক্রী, শবরী। চর্যাগীতিতে পটমঞ্জরী রাগটি বহু পদে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রাগ সম্ভবতঃ তিরহুতে প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতির পূর্বে পটমঞ্জরী রাগের উল্লেখ প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সময়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গ্রামরাগ ও জাতিরাগ প্রচলিত ছিল। গ্রামরাগ দুটি—ষড়জ গ্রাম এবং মধ্যম গ্রাম। জাতিরাগ আঠারোটি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থ ও দত্তিলাচার্যের দত্তিল গ্রন্থে আঠারোটি জাতি রাগের উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত নাদতত্ত্ব, শ্রুতির কথা, তান ও মূর্চ্ছনার কথাও এই গ্রন্থগুলিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে যে নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল তা অনুমান করা যায়।[১]

চর্যাগীতিতে কণ্ঠ, যন্ত্রসঙ্গীত ও গীতাভিনয়ের ত্রয়ী সম্মেলন হইয়াছে। ডোম্বীগণ নৃত্য, গীতপরায়ণী ছিল এবং সমসাময়িক কালে বিবাহ, যাত্রা উৎসবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহা আবৃত্তি সহকারে সম্মেলক হিসাবে গাওয়া হইত। চর্যাগীতিতে রাগের নামোল্লেখ থাকিলেও শুধুমাত্র রাগের কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়া গাওয়া হইত। সুতরাং রাগের শিল্পরূপ ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নয়। তদানীন্তন কালের রাগরূপ বর্তমান কালের রাগরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সঙ্গীতের ইতিহাসে চর্যাপদ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা রাগরাগিণীর মাধ্যমে সঙ্গীত চর্চা করিতেন—এমন কোন

১. লুপ্ত গান, বিলুপ্ত গায়ন রীতি—সুচেতা চৌধুরী (আনন্দবাজার পত্রিকা ৪-১-৮৭)।

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাধকগণ যে সময়ে পদগুলি রচনা করিয়াছেন তৎকালে রাগ রাগিণীর নামোল্লেখ করেন নাই। শিষ্য পরম্পরায় সেই সুরের কাঠামো চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহাতে সুরের নানা পরিবর্তন হওয়াও অস্বাভাবিক নহে, পরবর্তী চর্যাগানে লিপিকার সেই সুরের উপর ভিত্তি করিয়া রাগরাগিণীর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে মুনিদত্ত চর্যাগীতির টিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতেই চর্যাগীতিতে রাগরাগিণীর নামোল্লেখ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

কবি জয়দেব তাঁহার নিজস্ব রচনাকে প্রবন্ধ সঙ্গীত বলিয়াছেন। 'শ্রীবাসুদেব রতিকেলি কথা সমেত মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্' (২য় শ্লোক)। প্রবন্ধ গীত নিবন্ধ গীতের অন্তর্ভুক্ত। নিবন্ধ তিন প্রকার—শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র। প্রবন্ধ গান শুদ্ধ নামেও পরিচিত। শুদ্ধ বা প্রবন্ধ গানের চারিটি ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ। ধাতু অর্থাৎ অবয়ব বা বিভাগের নাম—উৎগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। যাহারা পঞ্চ ধাতুর কথা বলেন—তাহারা ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে একটি অংশের নাম দিয়াছেন অন্তরা। অঙ্গ ছয়টি—স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ, তাল। স্বর—সা-রি-গ-ম ইত্যাদি আলাপ, বিরুদ অর্থে প্রশংসা বা গুণবাচক বুঝায়। পদ বলিতে কথা অর্থাৎ যাহা অর্থ প্রকাশ করে। সঙ্গীতের সমস্ত অংশই পদ। 'তেন' মঙ্গলবাচক শব্দ এবং পাঠ বাদ্যের বোল। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের গান পঞ্চ ধাতু ও ছয় অঙ্গ যুক্ত মেদিনী জাতির অন্তর্ভুক্ত।[১] শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় গীতগোবিন্দের গানকে সালগ সুর শ্রেণীর প্রবন্ধ গীত বলিয়াছেন। জয়দেব প্রযুক্ত রাগের নাম—মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, কর্ণাট, দেশবড়ারি, গোণ্ডকিরি, ভৈরবী ও বিভাস। গীত-গোবিন্দে জয়দেব প্রযুক্ত তাল—রূপক, নিঃসারক, যতি, একতালী, অণ্টতালী। 'গীতগোবিন্দ' দল বাঁধিয়া গাহিবার রীতি ছিল। দশাবতার বন্দনার পর মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে 'শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদম্ মঙ্গলমুজ্জলগীতি' অর্থাৎ কবি ইহাকে মঙ্গলগীতি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সেকশুভোদয়া গ্রন্থ হইতে জানা যায় পদ্মাবতী ও জয়দেব উত্তম মার্জিত সঙ্গীতের চর্চা করিতেন।

জয়দেবের বৈষ্ণব গীতি কবিতা বাঙ্গালীর সাহিত্যধারাকে সঞ্জীবিত ও গীততরঙ্গে হিল্লোলিত করিয়া তোলে। বড়ু চণ্ডীদাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

১. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় / ৩য় সংস্করণ / ১৩৬২ / পৃ. ৬২।

রচয়িতা হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সকলে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে শুদ্ধগীতি যুক্ত হইত।

মধ্যযুগীয় সঙ্গীত চর্চার বহু উপকরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় ডঃ অরুণ কুমার বসুর 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি' নামক নিবন্ধে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গীতরূপ বিচ্ছিন্ন নয়—সমকালীন ও পরবর্তী বহু গীত সাহিত্যেই তা অনুবর্তিত হইয়াছে।[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ জাতির গান। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যে অংশ সঙ্গীত রূপে পরিবেশিত হইত, সেগুলি শুদ্ধাগীতের বিভিন্ন রীতি অনুসারে গাওয়া হইত। এই প্রাচীন নাট্যগীতির শুদ্ধা গীতের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে শ্রীরাজেশ্বর মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে শুদ্ধা গীতগুলি যথাক্রমে এলা, করণ, ঢেংকী, বর্তনী, লম্ভ, রাস ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এলা নামক গীতরূপের উদগ্রাহ অংশটি ছিল বৃহৎ, তার পরের অংশ ধ্রুব ও আভোগ। একটি সম্পূর্ণ এলা ১৬ পদের। এলা গীতির উদগ্রাহ অংশটি ছিল তিন ভাগে বিভক্ত—খণ্ডদ্বয়, প্রয়োগ ও পল্লব। ইহার বহু সূক্ষ্ম বিভাগও ছিল। উদগ্রাহ ও ধ্রুব সহযোগে করণ গীত হইত। ঢেংকীতে উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ চারিটি অংশ ছিল। এর বহু প্রকার ভেদের কথা জানা যায়। এই গুলির নাম যথাক্রমে কৈবাড়, দ্বিপদী, চক্রবাল, মাতৃকা ও পঞ্চতালেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিভিন্ন রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—আহের, ককু, কহু, কহু ও গুর্জরী, কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, গুর্জরী, দেশবরাড়ী, বরাড়ী দেশাগ, ধানুষী, পটমঞ্জরী, পাহাড়িআ, বঙ্গাল, বঙ্গাল বরাড়ী, বসন্ত, বিভাস, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, মাহারঠা, রামগিরি, ললিত, গৌরী, শ্রী, সিন্দেরা এবং যতি তাল, ক্রীড়া তাল, একতালী, লঘুশেখর, রূপক, কুড়ুক্ক, আধতালা প্রভৃতি তালের উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

---

১. প্রবন্ধ—মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি—ডঃ অরুণকুমার বসু, পৃঃ ১৫৯ (১৯৮৫)

সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কল্যাণ বাচক দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য নামে গীতিমূলক সাহিত্যের সূচনা হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরির গান এই দেশে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছোট ছোট পাঁচালীর আকারে লোকমুখে ছড়ার আকারে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীগুলি লিখিত হইত কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রাম্য কবিগণ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেন।

বাংলা মঙ্গলকাব্য অনুবাদ কাব্য (রামায়ণ মহাভারত), শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, চৈতন্য জীবনী কাব্য অর্থাৎ পয়ার ত্রিপদী নিবন্ধ কাব্যগুলি সুরে পাঠ করা হইলেও সম্ভবত প্রবন্ধ গীত বা শুদ্ধা গীতের আশ্রয়ে গাওয়া হইত না। পাঁচালী জাতীয় কাব্যে যে সাঙ্গীতিক মূল্য বিশেষ উচ্চমানের ছিল না তা কাব্যের আঙ্গিক গত দিক অনুসন্ধান করিলেই অনুভব করা যাইবে। এই সময়ের পাঁচালী গান ছিল আবৃত্তি ও কথকতার মিশ্রণে সৃষ্ট। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে পাঁচালী গানে কীর্তন প্রধান সুর প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম ও ঘনরামের বহু পুঁথিতে রাগ ও তালের উল্লেখ না থাকিলেও পালা গান হিসাবে গাওয়া হইত। পালা গান প্রথমে বন্দনা সৃষ্টি কাহিনী—উপক্রমণিকা। ইহার পর 'দেবখণ্ড'—দক্ষকন্যা সতীর ও হেমন্ত নন্দিনী পার্বতীর কাহিনী। মঙ্গলবারের দিবা ও নিশা এবং বুধবারের দিবা—তিন দফায় (পালায়) তিন অংশে গাওয়া হইত। দ্বিতীয় আখেটিক খণ্ড—দেবীর পশুপাল ও ব্যাধদম্পতী কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী, বুধবারের নিশা হইতে শুক্রবারের দিবা পর্যন্ত চার পালায় গীত। তৃতীয় বণিক খণ্ড—ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির কাহিনী—শুক্রবারের নিশা, শনিবারের দিবা ও নিশা, রবিবারের দিবা ও নিশা, সোমবারের দিবা ও নিশা (সারা রাত্রি) ও মঙ্গলবারের দিবা—নয় পালায় গীত। এই আট দিনে ষোল পালায় (অর্থাৎ অধিবেশনে) সুমঙ্গল রচনাটি গাওয়া হইত। এই ভাবে গীতপদ্ধতি অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল 'অষ্টমঙ্গলা' এবং 'ষোলপালা' গান। মনসামঙ্গলেও এই একই ধরণের গীতপদ্ধতি প্রচলিত ছিল।[১]

'বারমাসী গান' অর্থাৎ যে গানের দ্বারা মেয়েরা তাদের অন্তরের বারোমাসের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনাকে ব্যক্ত করে এবং বর্তমানে বাংলা দেশেও যে গানের

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস / পূর্বার্ধ / পৃ. ৫২৩ / ৬ষ্ঠ সংস্করণ / ১৯৭৮ —ডঃ সুকুমার সেন।

প্রচলন দেখা যায় তা মধ্যযুগে কাব্য রীতিতে এবং বিশেষ করিয়া মঙ্গলকাব্যে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হইয়া আছে।[১] মঙ্গলকাব্যে সন্নিবেশিত গ্রন্থরচনার কারণ ও কবির আত্মপরিচয় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। এই সকল পদে উদগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুবা, আভোগ না থাকায় ক্ষুদ্রভাবে রাগের উল্লেখ এই পদে থাকিলেও অনুমান করা হয় এগুলি গাওয়া হইত না। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যখানি কেবলমাত্র পাঠের জন্য রচিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যের কিছু অংশ পাঠ ও কিছু অংশ সুরে গাওয়া হইত।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে যে মঙ্গলকাব্যগুলি পাওয়া যায় অর্থাৎ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গীত অংশ প্রাচীন প্রবন্ধ গীতির রূপ অনুসারে গাওয়া হইত বলিয়া প্রকাশ।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রাগরাগিণীর মাধ্যমে সংকীর্ত্তনের গান হিসাবে প্রথমে চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি নামে এক ধরণের সম্মেলক গীতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আদর্শেই সম্ভবতঃ বাংলাদেশে সুর, তাল ও ছন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ের ভক্তি রসাত্মক গানের সূত্রপাত। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাময় যশোকীর্তির গান থেকেই কীর্তন কথাটি সৃষ্টি।

"নামলীলা বিহারণাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"

নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে রস ও ভাবাবেশে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যশোকীর্তির গানকেই বাংলার বৈষ্ণব সমাজ কীর্তন আখ্যা দিয়াছেন।

"নামগুণ লীলাদিনা মুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"

অর্থাৎ উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের নামগান, গুণ ও লীলা কথনের নামই কীর্তন। এই গান সম্মেলক রীতিতে নাম গানের বিশেষ ধারা। নৃত্য সহ নগর কীর্তনই মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ কীর্তন। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে চর্যা মহাজন পদাবলী এবং গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব পদাবলীর আদিম আদর্শ। চর্যাগীতি অধ্যাত্ম সাধনার গান এবং গীতগোবিন্দ পদগান থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দের পদগান শুনে শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া নামগান বা নামকীর্তন অথবা সংকীর্তনের সাঙ্গীতিক রূপের প্রবর্তন করেন। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন, তখন তাহাকে সংকীর্তন, বহুজনে একত্রে কীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করিলে নগর সংকীর্তন নামে অভিহিত হয়। কীর্তনের

১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস / ৬ষ্ঠ সংস্করণ / ১৯৭৩ / পৃ. ৩০—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

দুইটি বিভাগ—প্রথমটি নাম কীর্তন বা নাম সংকীর্তন, অপরটি লীলা কীর্তন বা রস কীর্তন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ" প্রভৃতি নাম গানকেই নামকীর্তন বলা হয়।

কীর্তনের ইতিহাসে খেতুরীর মহোৎসব এক স্মরণীয় ইতিহাস। গোপালপুরের জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম যৌবনকালে বৃন্দাবনে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসত্ব গ্রহণ করেন। গরাণহাটি পরগণায় খেতুরী গ্রামে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এই উৎসব খেতুরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এখানে কীর্তন পরিবেশনের একটি নির্দিষ্ট রীতি প্রবর্তিত হয়। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদীয় সঙ্গীত হইতে কীর্তনের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রীতিতে গোকুলানন্দ প্রথমে অনিবদ্ধ গীতরূপে আলাপ করিলেন অর্থাৎ বর্ণ ন্যাস স্বরালাপের দ্বারা গীতের সূচনা হয়।

আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য ধরে।।

ভক্তি রত্নাকর

উদারা, মুদারা, তারা এই তিন স্বরগ্রাম হইতে গায়কের সুরলহরী শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। গায়কগণ প্রায় সকলেই নরোত্তম ঠাকুরের পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুকে অন্তরে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গান ধরিলেন।

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে।।
রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা।।
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম।।

—ভক্তি রত্নাকর।

ভক্তি রত্নাকরের মাধ্যমে জানা যায় যে কীর্তনের সহিত শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হইত না।

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল[১]
তাহে স্পর্শাইলা শ্রীচন্দন ফুলমালা ।।

—ভক্তি রত্নাকর / নবম তরঙ্গ

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুরকে মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং এই রীতি বর্তমানেও প্রচলিত আছে। অতঃপর নরোত্তম ঠাকুর নিবন্ধ গীতরীতিতে অর্থাৎ কথা ও সুরের সমন্বয়ে কীর্তন গান পরিবেশন করিলেন।

প্রবন্ধ গীতির পাঁচটি জাতি আছে। অর্থাৎ ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ মেদিনী জাতীয়, পঞ্চাঙ্গযুক্ত নন্দিনী, চতুরঙ্গযুক্ত দীপনী, অঙ্গত্রয়ে পাবনী এবং অঙ্গদ্বয়ে তারবেলী জাতীয় হয়। এই প্রবন্ধ গীতি নিবন্ধ শ্রেণীর এবং কীর্তন গানে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। খেতুরীর মহোৎসবে আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কীর্তনগানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকার গান। সম্ভবতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবকে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুর এই রীতি শুরু করিয়াছিলেন। বর্তমানেও কীর্তন গায়কগণ গৌরচন্দ্রিকা করিবার সময় দলের সকলকে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন করেন এবং গৌরচন্দ্রিকা সমাপন হইলে পরবর্তী অংশ উপবেশন করিয়া সমাপ্ত করেন।

'শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ'—খেতুরীর উৎসবের আগে এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান 'শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার' লীলা গাহিবার পূর্বে গাওয়া হয় নাই। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই কীর্তন গাহিবার পূর্বে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিবার রীতি অবলম্বিত হয়। খেতুরীর মহোৎসবে যে কীর্তন পরিবেশিত হয় তাহাতে নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

"চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের নাহি অন্ত
নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত" —ভক্তি রত্নাকর

নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সমাবেশেই সঙ্গীত। কীর্তন গানে সঙ্গীতের প্রকৃত সমন্বয় রূপ দেখা যায়। নরোত্তম ঠাকুরের কীর্তন গায়ন পদ্ধতি 'গরাণহাটি' শ্রেণীতে পড়ে। খেতুরীর পরগণা নামানুসারে সম্ভবতঃ এরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ায় যে মহোৎসব হয় সেখানেও এই গরাণহাটির পদ্ধতি অনুবর্তন হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বংশীবদন ঠাকুর ও আউলিয়া মনোহর দাস নামে দুইজন বৈষ্ণব সাধক গরাণহাটি পদ্ধতিকে শিথিল করিয়া কঠিন গায়ন পদ্ধতি ও তালের কড়াকড়িকে ভাঙ্গিয়া

১. কীর্তন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র / বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ / পৃ. ৩৯/পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ/ ১৩৮৯।

লৌকিক বাউল সুরের সংমিশ্রণে মনোহরশাহী কীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মনোহরশাহী কীর্তনের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়ে। কবিগান ও আধুনিক পাঁচালী গানে এর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। মনোহরশাহী পরগণা (বর্ধমান জিলা) হইতে মনোহরশাহী, রাণীহাটি (বর্ধমান জিলা) হইতে রেণেটি এবং মান্দারণ (মেদিনীপুর) হইতে মন্দারিনী বা মান্দারিনী সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। রেনেটি গীত টেঁয়া বৈদ্যপুরে বৈষ্ণব দাস (গোকুলানন্দ সেন) ও তাঁহার বন্ধু উদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) প্রভৃতির দ্বারা সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

এই গীতরীতিতে কীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ শ্রুতি ও গমকের প্রাধান্য, রাগরাগিণীর বিশিষ্ট ভঙ্গি, ছন্দের নূতনত্ব (দশকুশী, ডাশপাহিড়, তেওট) এবং আখরের যোজনা বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ঝাড়খণ্ডী শ্রেণীর গায়নরীতির কীর্তনও প্রচলিত ছিল। তবে এ রীতির কীর্তন বিশেষ প্রচলিত নহে।

গরাণহাটি রীতির পূর্বে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদগুলি সম্ভবতঃ প্রাকচৈতন্য যুগের প্রবন্ধগীতি শুদ্ধাগীতির আদর্শে গাওয়া হইত। এই পদগুলি ধানশ্রী, পটমঞ্জরী, বরাড়ী, সুহই, কামোদ, সিন্ধুড়া, তোড়ি, গৌরী, দেবগিরি, ভৈরবী, বিভাস, বসন্ত, মায়ুর, সারঙ্গ, বাহার, গুর্জরী, মল্লার, পাহাড়ী, বেলোয়ার প্রভৃতি রাগের আধারে গঠিত। নরোত্তম দাস গুর্জরী রাগের উপর ভিত্তি করিয়া নামকীর্তনের একটি বিশিষ্ট সুরের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কীর্তনের বিশেষ উন্নতি সাধন হইলেও কবিগান ও পাঁচালীর প্রভাবে কীর্তনের জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষতা হ্রাস পাইতে থাকে। কীর্তনকে ভাঙ্গিয়া 'ঢপের' সৃষ্টি হয়। আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কীর্তন শোনা যায় যেগুলি 'ঢপকীর্তন' নামে পরিচিত। এই গীত অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচালী, বাউল গান, কথকতা ও নাটগীতির প্রভাবে প্রভাবিত। ঢপে গানের ভাগ অতি অল্প, ঘটনা বৃত্তান্ত বক্তৃতার দ্বারা প্রকাশ পায়। শেষে তাল-মান-স্বর সহযোগে একটি তুক বা গানের অংশ গাহিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার টানা হয়। মধুসূদন কান এই রীতির গীতকে যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করেন।

বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে নানা ধরণের লোকগীতি ও বৈঠকী গান জনচিত্তে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। পুরাতন গানের ক্রমবিবর্তনে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, আখরাই, নেটো, আর্জা, তর্জা, খেউড়, হাফ-আখরাই ও ঝুমুর গানের প্রচলন বিশেষভাবে দেখা যায়। দেবপূজার

উৎসবে বা রাজকীয় সমারোহের শোভাযাত্রায় যাত্রা নামক বিশেষ নাট্যগীতির প্রচলন ছিল। পাত্র পাত্রীগণ নিজেদের জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া সংক্ষেপে ঘটনা আবৃত্তি বা গান করিত। কখনও কখনও গানগুলি নির্দিষ্ট থাকিত এবং নটেরা সংলাপ বলিয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত 'কবিগান' নামক এক প্রকার বিশেষ সঙ্গীতধারা গীত ব্যবসায়ী শ্রেণীবিশেষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহার নির্দিষ্ট পরিভাষা না থাকিলেও রচনাসম্ভার ও গীতরীতি কালক্রমে বিশেষ প্রকার লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

কবিগান দুই দলের মধ্যে সামনা সামনি দাঁড়াইয়া চাপান-উতোর ক্রমে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্বমূলক বিষয় লইয়া গান শুরু করিলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই গীতগুলি ব্যক্তিগত অশ্লিল গালিগালাজে পরিণত হইত।

অষ্টাদশের শেষভাগে কবিগণের পরিবর্তিত রূপ 'পাচালী গান' নূতন পরিবেশে রূপান্তরিত হয়। বলা বাহুল্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালী কাব্যের অন্তর্গত ছিল। আধুনিক পাঁচালি গানে পাঁচটি উপাঙ্গ (গীত, সাজ বাজান অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের মেলক সঙ্গীত, ছড়া কাটানো, গানের লড়াই ও নৃত্য) আছে বলিয়া এই গানকে পাঁচালী নামে অভিহিত করা হয়। মনোমোহন বসু আধুনিক পাঁচালীর পাঁচটি উপাঙ্গের কথা বলিয়াছেন[1]—(সাজ বাজানো, শ্যাম বিষয়ক, সখী সংবাদ, বিরহ, ছড়া কাটানো)। পাঁচালী নানা ছন্দে গাঁথা কাব্য। পাঁচ জনে দাঁড়াইয়া চামর হাতে এ গান গাহিত। কেহ কেহ এই গানকে আবৃত্তির সমপর্যায় মনে করেন। কবিগান ও পাঁচালীতে প্রভেদ হিসাবে ধরা যায় পাঁচালী গান পূর্বেই রচিত হয়, কিন্তু কবিগান ঘটনাস্থলেই রচিত হয়।

হেঁয়ালী ছড়ায় প্রাকৃতের আর্যা ছন্দে লেখা উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে আনন্দ দান করার বিধির নাম আর্যাগীত।

গ্রাম্য ভাষায় আদি রসাত্মক কাহিনীমূলক প্রচলিত গানকে খেউড় বলে। অনেকের মতে কবিগানের উগ্র আদি রসাত্মক অংশকে খেউড় বলা হয়।

কবিগান, দাঁড়া কবি, আখরাই, হাফ আকরাই গান এক গোত্রোদ্ভূত হইলেও এদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র গীতরীতি ছিল।[2] বাংলা আখরাই গানে তিনটি

১. গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৮৮৭) মনোমোহন গীতাবলী—পৃ. ১৬১—১৬৩।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/৪র্থ খণ্ড—পৃ. ২৬৪—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্ব ছিল—ভবানী বিষয়ক, খেউড় ও প্রভাতী এবং প্রতিটি পর্বে মহড়া, চিতেন ও অন্তরা—এই তিনটি গায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হইত। মোহনচাঁদ দাঁড়া কবির আদর্শে হাফ আখরাই গানের প্রবর্তন করেন এবং পংক্তি বিন্যাসে দাঁড়া কবির রীতি অনুসরণ করিতেন বলিয়া প্রকাশ। বিবিধ রাগরাগিণী ও যন্ত্র সহযোগে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক আখরাই গান বাংলাদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। হাফ আখরাই গান অপেক্ষাকৃত সহজ সুরে ও কম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হইত। নেটো ও ঝুমুর গান নৃত্য, গান, সংলাপ সম্বলিত আদি রসাত্মক শ্রেণীর গান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের গীতরীতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইতেছে, একদিকে যেমন বাংলার শিষ্ট সমাজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকলা, প্রাক্ মুসলিম যুগে হিন্দুর ধ্রুপদ অঙ্গের গান এবং মুঘলযুগে উত্তর ভারতীয় ইন্দোমুসলিম মিশ্র মার্গরীতি—অর্থাৎ খেয়াল রীতি অনুশীলিত হইতেছিল, অপরদিকে শাস্ত্রীয় রীতিকে অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে কীর্তন রীতির বিভিন্ন ঘরাণা বাংলা দেশের সঙ্গীতকলায় নূতন বেগ দান করে। পুনরায় অপর দিকে গ্রাম্য পরিবেশে অনভিজাত পল্লীবাসীদের মধ্যে ঝুমুর, ধামালি, কুশল গান (আসামে প্রচলিত) জাগের গান (রংপুরে প্রচলিত) এবং মুসলিম সমাজে জারি, সারি, মুর্শিদা, মারফতি এবং লৌকিক ও ধর্মীয় গান নিজ নিজ স্বাভাবিক অধিকার অর্জন করিয়াছিল। এই সকল গ্রাম্যগীতি কিছু লঘু ধরণের নৃত্য চপল, কোথাও উগ্র আদি রসের প্লাবনে দূষিত, যা আধুনিক কালের ভব্যরুচিকে কিছু পীড়িত করে। দেশীয় লোকসঙ্গীতে সুরের সঙ্গে নাট্যধর্মী সংলাপ, নৃত্য ও কায়িক-বাচিক অভিনয়েও প্রভাব আছে।[১]

প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত কবিয়াল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ওরফে হরু ঠাকুরের একটি সখী সংবাদ বিষয়ক এবং কবিয়াল রাম বসুর ভবানী বিষয়ক দুইখানি পদ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইল।

হরু ঠাকুর : সখী সংবাদ

—মহড়া—

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে।

তবে কি হবে স্বজনি।

লম্পট স্বভাব তার জানি।

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২৩২—২৩৩।

ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ॥

—চিতেন—

ছিলো যে সংকেত হরি আসিবে নিশ্চয়
বিলম্ব দেখে তার হতেছে সংশয়।
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার
গাঁথিলাম সিখি গলে দিন কার
যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমনি ॥

—অন্তরা—

কৃষ্ণ প্রাণা আমি, আমার অনন্ত গতি ;
বলে কি জানাব তোমায়, তুমি কি জান না মতি ॥

এ-মেতে হয়েছে যত নিশি অবশেষ
শ্যাম বিনে ততই বাজিতেছে ক্লেশ।
আমারো আশায় এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়া পথ নিরীক্ষণ।
মাধব না এসে যদি, এসে দিনমণি।

—মহড়া—

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ
কালে বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও।
এ অধীনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হেসে বাঁশিটি বাজাও ॥

—চিতেন—

নির্জনে এখন না পাব দরশন
যায় নিশি যাক্ জানুক গুরুজন।

তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ।
ও বংশীর গুণ কতো বিশেষে শুনাও ॥

—অন্তরা—

শ্যাম শুন শুন যাও কেন, রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥

—চিতেন—

কোন্ রন্ধ্রে হরে ধ্বনি, কুলবতীর মন।
কুল সহিত হে করিলে হরণ।
কোন্ রন্ধ্রে হরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥

ভবানী বিষয়ক : রাম বসু

—মহড়া—

তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে।
গিরিরাজ, ওহে, শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে ॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে, হে কৈলাসে যাই বোলে
এসে বলতে, মেনকা, তোমার দুখের কথা উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষানী, আপনি ঈশানী আসতে চেয়েছে ॥
তুমি গিয়েছিলেই, উমা বলে ঐ হে, আমি আপনি
এসেছি জননী বলে ॥

—চিতেন—

তারা হারা হোয়ে নয়নের, তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই ॥
আমার সেই হারা তারা, ত্রি জগতের সারা, বিধি এনে মিলালে।
উমা বদনে ডাকছে সঘনে মা, মা, মা বলে ॥
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ॥

—অন্তরা—

ভালো হোক ওহে গিরি। জাই আমি নারী তাই তুলি বচনে।
তোমারে কি মনে হোতো না হে সাধ, হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।

—চিতেন—

আশাবাক আমার পাপ প্রাণ, রহে বলো কতদিন।
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন॥
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বসের তাকে,
আস্তে তো যেতে হয়।
কেন মা হীনা কন্যা, তিন দিনের জন্য এলো হে, হিমালয়॥
মুহো করা হাহারব, ছিলেন যেন শব হে,
গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য

ভারতীয় সাঙ্গীতিক ধারার বিষয়ে পর্যালোচনা করিতে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সঙ্গীতের এক সুমহান ঐতিহ্য ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র উপাদানগুলি এবং সঙ্গীতের নানা বিষয় বস্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সে যুগের সমাজবাসীদের মধ্যে সঙ্গীত এক বিশেষ স্থান গৃহীত হইয়াছিল। অধিকন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ শিব ও শক্তির মিলনের মাঝে সঙ্গীত সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হইলেও পশুপক্ষীর ডাক ও প্রকৃতির অন্যান্য শব্দলহরী অনুকরণে সঙ্গীত সৃষ্টি বিষয়েও অনেকে একমত।

প্রাগ্‌বৈদিক সিন্ধু উপত্যকার সময়কাল সম্ভবতঃ ৩০০০-২৫০০। সিন্ধু উপত্যকা তথা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে সাতটি ছিদ্রযুক্ত এক বাঁশী পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে সে সময় সাত সুরের সমন্বয়ে সঙ্গীত পরিবেশনের রীতি ছিল। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের ত্রয়ী সম্মেলনে সঙ্গীত যে তদানীন্তন কালে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

২৫০০-২০০০ শব্দ ঋগ্বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সকল ঋক রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি স্বরযুক্ত করিয়া গাওয়া হইত এবং এইগুলির সমসৃষ্টিতেই সামবেদ বা সাম সংহিতার প্রকাশ। সামবেদ 'আর্চিক' ও 'স্তোভিক' এই দুই ভাগে বিভক্ত। ঋকমন্ত্রের যেগুলির উপর স্বর সংযোগ করিয়া সামগান গাওয়া হইত। তাহাকে যোনি বা মূলগান বলা হইত। সামবেদের গানের বিভাগ পূর্বাচিক, আরণ্যক সংহিতা ও উত্তরার্চিক -এই তিন ভাগে বিভক্ত। অপরদিকে গ্রামেগেয়, অরণ্যেগেয়, উহ্য ও উহ—এই চারিটি গান ভাগের উপর সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতের অংশ রচিত হইত। ভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে সামবেদে সামগানের অসংখ্য প্রকাশ ভঙ্গির উল্লেখ আছে।

"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ"[১]

দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিবাচক সামগান 'স্তোত্রিয়' নামে এবং তিনটি ঋকযোগে যে

১. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—২য় খণ্ড—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৬১)—পৃ. ৬।

গান করিবার রীতি ছিল, তাহা 'স্তাত্রিয়' নামে অভিহিত হইত। সামগান যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হইলেও সম্ভবতঃ ছন্দ ও লয় সহযোগেই গাওয়া হইত। বিভিন্ন বেদের শাখায় সামগানের ভিন্ন ভিন্ন বিধি-রীতি আরোপিত হইত। স্বর সংখ্যা প্রয়োগের তারতম্যে ঋত্বিক ও সামগদের গায়নধারার মাঝে পার্থক্য সূচিত হইত। আর্চিক যুগে এক স্বর, গাথিক যুগে দুই স্বর, সামিক যুগে তিন স্বর, স্বরান্তর যুগে চার স্বরের সমন্বয়ে গান গাওয়া হইত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট ও অতিস্বার নামাঙ্কিত সাত স্বরের ব্যবহার সামগানে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

উপনিষদের যুগে সামগানের সাত প্রকার গায়ন রীতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যথা বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ম, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত।

বৈদিক যুগে স্বরের মান বেনুর সাহায্যে নির্ণয় করা হইত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ -৫০০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতক পর্যন্ত ভারতে গান্ধর্ব শ্রেণীর গান প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত নামক জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রী বৈদিক সঙ্গীতের উপাদান সম্বলিত গান্ধর্ব গায়ন রীতির কাঠামো গঠন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় অব্দে ভরত উল্লেখ করিয়াছেন—

যে গান দেবতাদের অত্যন্ত ইষ্ট বা কল্যাণজনক, গন্ধর্বদের প্রীতিকর এবং স্বর, তাল ও পদযুক্ত তাহাকেই গান্ধর্ব গান বলা হয়।

"অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ
গন্ধর্বানামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে"

অধিকন্তু ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে গান্ধর্ব গানের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন :

"গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্" (২৮/৮)

খৃষ্টপূর্ব (৫৪৪—৪৯৭) পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডির চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চল তথা গান্ধার দেশ পুক্কুসাতি-রাজার অধীনে ছিল। উত্তরাপথে কাম্বোজ ও মগধের সহিত গান্ধার দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। গন্ধর্ব জাতির প্রধান কেন্দ্রস্থল গান্ধার। এই জাতি সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রিয় ও প্রীতিকর সঙ্গীতকেই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন 'গান্ধর্ব'—"তথা প্রীতিকরং পুনঃ গন্ধর্বানামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে" (২৮।৯)। গন্ধর্বদের প্রবর্তিত ত্রৌর্যত্রিক বিদ্যা গান্ধর্ব বা বৈদিকোত্তর মার্গ সঙ্গীত।

ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। গান্ধর্ব বা মার্গ গীতিকে রামায়ণকার 'সঙ্গীত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড—২৮।৩৬-৩৭)। এই সময় গান্ধর্ব হিসাবে "জাতি রাগ" ও "গ্রাম রাগ" গানের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। জাতি রাগ ও গ্রামরাগগুলি ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্চ্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, লয় ও বিচিত্র রসে গানের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। অধিকন্তু সাতটি শুদ্ধ জাতিগান বা জাতি রাগের প্রচলনও ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রথম বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ রহিয়াছে। বালকাণ্ডের বিভিন্ন শ্লোকগুলির মাধ্যমে জানা যায় যে বাল্মীকি বৈদিক ও লৌকিক উভয় সঙ্গীতে বিশেষ কৃতবিদ্ ছিলেন। রামায়ণকারের মতে গানের ভাষায় অক্ষর, অক্ষরযুক্ত পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক নতুবা স্বরযুক্ত হইয়া গেয় বা গানের উপযোগী হইতে পারিবে না। অযোধ্যা কাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাণিবাদক সূত, আশীগান ও গাথা গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আশীগান বা গাথা বীণা সহযোগে গাওয়া হইত—"বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ"। সম্ভবতঃ এই গাথা বা আশীর্বাদ সূচক গান রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব শ্রেণীভুক্ত ছিল। মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশে কণ্ঠের ধ্বনির তারতম্য হওয়াকে 'কাকু' বলা হইত। মহামুনি বাল্মীকি গীতে কাকু স্বরের প্রয়োগ সম্পর্কে কুশী লবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; ফলে জাতিগান ও রামায়ণ গান বিশেষ সুমিষ্ট হইত। "তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ"। এই সময়ে সঙ্গীত সম্ভবতঃ স্বর, তাল ও পদযুক্ত এবং বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে প্রচলিত ছিল। গ্রামরাগের অন্তর্ভুক্ত কৈশিক রাগের সম্পর্কেও এই সময়ে জানা গিয়াছে।

মহাভারতের যুগে গীত, নৃত্য ও বাদ্যের ত্রয়ী সম্মেলনের কথা জানা যায়। মহাভারতকার আশ্বমেধিক পর্বে যে সাতটি লৌকিক ষড়জাদি স্বরের ব্যবহারের কথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা শব্দের গুণ হিসাবে উল্লিখিত। এই যুগে রথন্তর ও বৃহদ্ সাম দুইটির বিশেষ প্রচলন ছিল।

"রথন্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে, যত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈবৃর্তাচ"

মহাভারতে মঙ্গলগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

"সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈর্গীত মঙ্গলৈঃ"

—[দ্রোণপর্ব ৫/৪১]

সাধারণতঃ শিবের স্তুতির উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হইলেও সূত, মাগধ, বন্দীগণ প্রজাপতিপালক রাজাদের ও বীরশ্রেষ্ঠদের কল্যাণ ও বিজয়গাথা ঘোষণার জন্য মঙ্গলগান পরিবেশন করিত। এই যুগে বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

বিরাট সুতার শিক্ষাগুরু হইবার জন্য মহাভারতে অর্জুন বলিয়াছেন—

"গায়া মি নৃত্যামাথবাদয়ানি ভদ্রোহস্মি নৃত্যে কুশলোহস্মি গীতে।"[১]

সপ্ততন্ত্রী বীণা, শংখ, বেণু, মৃদঙ্গ, আড়ম্বর, পণব, তুরী, পটাহ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় "হরিবংশের কালে তৎকালীন সমাজে লৌকিক ও বৈদিক এবং গান্ধর্ব ও সাম গানের বিশেষ অনুশীলন হইত। হরিবংশে হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, উগ্রসেন, ভদনটের সহায়তায় যাদবগণের রামায়ণ অভিনয়াদি প্রভৃতিতে সঙ্গীতের বিশেষ উপকরণ ছিল। ছালিক্যগীতি যাদবকুলের অত্যন্ত প্রিয় গীত ছিল। এই গীত গান্ধর্বগানের শ্রেণীভুক্ত এবং নিবন্ধগান হিসাবে পরিবেশিত হইত। ছালিক্যগান ছয়টি গ্রামরাগ ও বিভিন্ন তালযুক্ত হইয়া প রবেশিত হইত। মাতু ও রাগের সমাবেশও এই গানে পাওয়া যায়। হরিবংশের সমাজে সম্ভবতঃ গান্ধারগ্রামের প্রচলন ছিল। 'আগান্ধার গ্রামরাগং' এই শব্দটির উল্লেখ 'হরিবংশে' পাওয়া যায়। উপরন্তু এই সময়ে গান্ধাররাগের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়।

"ততস্তু দেবগান্ধারম্"

হরিবংশ পুরাণে ছালিক্যগীতির টীকায় নীলকণ্ঠ বিচিত্র রাগ, তাল, মূর্চ্ছনা, লয় প্রভৃতি উপাদানগুলির বর্ণনা করিয়াছেন: এতদ্ভিন্ন তিনি মধ্যা, শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী, মিশ্রা, গীতরূপ নামে ছয়টি গ্রামরাগের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

মৌর্যযুগে ও বৌদ্ধসাহিত্য 'গান্ধর্ব সঙ্গীতবিত্তো' গান্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্য জাতকে মেঘগীতি এবং গুপ্তিল জাতকে 'উত্তম-মধ্যম মূর্চ্ছনা ও সপ্ততন্ত্রী বীণার নামোল্লেখ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। গাথার মাধ্যমে সম্ভবতঃ সে যুগে উত্তর প্রত্যুত্তর দিবার রীতি ছিল। গাথাগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে গাওয়া হইত। লংকাবতীর সূত্র গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে রাবণের বীণায় যে সাতটি স্বরের নাম ও ক্রম সন্নিবেশন কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল, যথা সহর্য্য, ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত, নিষাদ, মধ্যম ও কৈশিক।

প্রাচীন ভারতে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ যুগে মালব, পাঞ্চাল, কুরু, গান্ধার, চেদী, মদ্র, শালব, আভীর, কেকয়, পুলিন্দ, কুলিন্দ, নিষাদ, লিচ্ছবি, শবর, চোল, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ন প্রভৃতি ৮৮ জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষ অনুশীলন হইত। সেই জাতিগুলির অনেকের

১. বেদোত্তর সঙ্গীত—ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৮১)—পৃ. ২১

নিজস্ব সুর পরবর্তীকালে সম্ভবত অভিজাত দেশী সঙ্গীতে রাগ হিসাবে গণ্য হইয়াছিল, যথা শবরী > সাবেরী, আভীরি, মালব, বাঙ্গালী, গৌড়, পুলিন্দকা, গান্ধারী বা গান্ধার।[১]

খৃষ্টীয় ২-৩য় শতাব্দীতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র নামক গ্রন্থে সঙ্গীতের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। ২৮ অধ্যায়ে জাতি, জাতিগান এবং ৩২ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধ্রুবাগীতির আলোচনায় রাগ ও গানের বর্ণ, অলংকার, মূর্চ্ছনা, রস ও ভাব প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। গান্ধর্ব গানে দুইটি কোমল তথা বিকৃত (অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ) স্বরের ব্যবহারের কথাও জানা যায়। গান্ধর্ব সঙ্গীত 'জাতি রাগ' ও 'গ্রাম রাগ' বলিয়া দুইটি ধারায় লীলায়িত হইত। ভরতের মতে জাতি রাগ নির্ণয়ে ১০টি লক্ষণ প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশিত।[২]

"গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ন্যাসোপন্যাস এব চ
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়ুবিতে তথা"

পুনরায় ভরতের মতে গ্রাম মাত্র দুইটি বলিয়া উল্লেখ করেন[৩]

"দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি"

এই সময়ে গান্ধার গ্রাম সম্ভবতঃ অপ্রচলিত ছিল। পঞ্চম স্বরের স্বরস্থান বা তার এক শ্রুতির ব্যতিক্রম করিয়া ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম নির্ণয় করা হইত।[৪]

ভরত বীণার মাধ্যমে স্বরের প্রকাশ ভঙ্গির বিষয় নিরূপণ করিয়া "ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবতো নিষাদ স্বরা" অর্থাৎ সপ্ত স্বর হিসাবে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবতা ও নিষাদের নামকরণ করিয়াছেন। গানকে তিনি দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা গ্রামগেয় গান (সাধারণ সমাজের জন্য) এবং অরণ্যগেয় গান (অরণ্যচারী আধ্যাত্মিক শান্তিকামী ঋষিদের জন্য)। বাইশ শ্রুতি, অংশ, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী স্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা তাঁহার এই গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়। ভরতের মতে ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত হইলে গান এবং স্তুতিমূলক সংকীর্তন বলা হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত প্রভৃতি আটটি রসে গান লীলায়িত হইয়া থাকে। গান্ধর্ব গানে আর্চিক (এক স্বর যুক্ত), গাথিক গাথা (দ্বি স্বর যুক্ত),

---

১. সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—পৃ. ১৯৯
২. ঐ ঐ পৃ. ২৭১
৩. ঐ ঐ পৃ. ৬৬
৪ ঐ ঐ পৃ. ২৬২

সামিক (ত্রি স্বর যুক্ত), স্বরান্তর (চতুঃ স্বর যুক্ত), ঔড়ব (পঞ্চ স্বর যুক্ত), ষাড়ব (ষষ্ঠ স্বর যুক্ত) ও সম্পূর্ণ (সাতটি স্বর যুক্ত) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সপ্ত স্বর প্রয়োগের তারতম্যে বর্তমান কালে চারিটি স্বর লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র শেষোক্ত ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির প্রয়োগবিধি মান্য করা হয়। মুনি ভরত রাগের দশ লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

"গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ন্যাসোপন্যাস এব চ
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়বিতে তথা।"[১]

ইহা ব্যতীত আঠারটি জাতি, চারি শ্রেণীর গান (মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা) দেশ সম্ভবা গীত ধাতু, অলংকার প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত আঠারটি জাতি রাগের বর্ণনায় ভরত সাতটি শুদ্ধ ও এগারটি বিকৃত স্বর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম, স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে তেষট্টি প্রকার অলংকার এবং ক্রমযুক্ত স্বুর অর্থাৎ মূর্চ্ছনা, তিনটি স্থান প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আট প্রকার রসের এবং সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার ভাব সম্পর্কে বলিয়াছেন রস জনক, ভাব জন্য অর্থাৎ রস হইতেই ভাবের সৃষ্টি। ভরতের সময়কালে এবং তাঁহার পরবর্তীকালে কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শাস্ত্রীর কথা জানা যায়, যথা স্বাতী, কোহল, বিশাখিল, দত্তিল, শাণ্ডিল্য, নন্দিকেশ্বর, যষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শার্দুল, বিশ্বাবসু ইত্যাদি।

আচার্য কোহল বৈদিক রীতিতে সাত স্বরের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি রাগ রূপায়ণে মূর্ছনাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। বিশ্বাবসু স্বর ও শ্রুতিকে তৎকালীন সময়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রুতি স্বরের প্রকাশ ভেদে একের অধিক বলিয়া মনে করা হয়। আচার্য শার্দুল দেশজ রাগ সম্বন্ধে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রুতিকে পাঁচটি জাতি অর্থাৎ দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা ভাগে ভাগ করিয়াছেন। আচার্য দত্তিলের মতে পদ, স্বর ও তাল গভীর মনোযোগ সহকারে সুচারুরূপে পরিবেশনেই গান্ধর্ব গীতের প্রকাশ। তিনি বিকৃত স্বর বলিতে অন্তর গান্ধার ও কাকলি নিষাদকে সমর্থন করিয়াছেন। যাষ্টিক রচিত 'সবাগম সংহিতা' গ্রন্থের মাধ্যমে দেশী সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে বিশেষ জানা যায়।

চতুর্থ শতাব্দীতে 'নারদীয় শিক্ষায়' পঞ্চম, ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম, সাধারিত, কৈশিক মধ্যম ও কৈশিক এই সাতটি গ্রাম রাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১. সঙ্গীত প্রবীণ—শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার (১৯৬৫) পৃ. ১১৬

আনুমানিক খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দীতে মতঙ্গ মুনির গ্রন্থ "বৃহদ্দেশী" মাধ্যমে সাতটি শুদ্ধ স্বর, দুইটি বিকৃত স্বর, চারি প্রকার বর্ণ (স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী) এবং দুইটি গ্রাম যথাক্রমে ষড়জ ও মধ্যম বলিয়া স্বীকৃত হয়। রাগ লক্ষণ প্রসঙ্গে মতঙ্গ ভরতের মতকে সমর্থন করেন। রাগগুলির মধ্যে ছিল সাতটি গীতি, যথা শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এবং ছয়টি সাধারণ গীতি হিসাবে হর্মাণ পঞ্চম, বিদেশী, রূপ সাধারিত, গান্ধার পঞ্চম, ষড়জ কৈশিক স্বীকৃত, আটটি রাগ গীতি বলিতে টক্ক / টংকী, সৌবীর, মালব পঞ্চম, ষাড়ব, মালব কৌশিক, বোট্ট, হিন্দোলক ও টক্ক কৌশিক এবং অবশিষ্ট ভাষাগীতির মধ্যে টক্ক রাগে প্রভৃতি ১৬টি দেশী রাগ (২) সৌবীর- সৌবীরা প্রভৃতি ৪টি দেশী রাগ পঞ্চম রাগে আভারী প্রভৃতি, (৪) ভিন্নষড়জ রাগে বিশুদ্ধাদি ৯টি দেশরাগ কলিন্দী, পুলিন্দিকা বা পুলিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগে শুদ্ধাদি ৮টি, বোট্ট রাগে মঙ্গলা, হিন্দোলে বেসরী প্রভৃতি, ৫টি দেশী রাগ, টক্ক কৈশিক দ্রাবিড়ী, মালবা প্রভৃতি অন্তর্গত রাগ বলিয়া সুনির্দিষ্ট করেন। তিনি বলিয়াছেন দেশ ও জাতির নামানুসারে রাগগুলি মার্গ প্রকৃতি সম্পন্ন অভিজাত দেশী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। মতঙ্গ যতিভেদ অর্থাৎ পদ বিচ্ছেদ অনুসারে সাতটি বনৈলার উল্লেখ করিয়াছেন। রমণী, চন্দ্রিকা, লক্ষ্মী, পদ্মিনী, রঞ্জনী, মালতী এবং মোহিনী।[১]

'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা নারদ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দুই প্রকার রাগের শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন, তম্মধ্যে প্রথম প্রকারে ভূপাল, ভৈরব, শ্রী, পটমঞ্জরী, নাট, বঙ্গাল, বসন্ত ও মালব এবং দ্বিতীয়তে শ্রী, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ ও ভৈরবকে মান্য করিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাগ রাগিণীকে পুরুষ, স্ত্রী ও পুত্র রাগের পর্যায়ে বর্গীকরণ করিয়াছেন।

পৌরাণিক কালের (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী) পুরাণগুলিতে বিশেষ করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে প্রচলিত ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাগ রাগিনীর নাম এই পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। যথা যামিনী, শর্বরী, রূপবতী, মঙ্গলা, কালগুর্জরী, চন্দ্রমুখী, শ্যামকেশী প্রভৃতি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাত স্বর, পাঁচটি গ্রামরাগ, পাঁচটি শুদ্ধগীতি, মূর্ছনা, একান্নটি তান, তিন গ্রাম, চার রাগময় পদ, তিনটি লয়, তিনটি তাল, তিনটি যতি এবং চারি শ্রেণীর বাদ্যের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এই

১. সঙ্গীত সমীক্ষা—রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৬৬) পৃ. ১৫৯

সময়ে পটহ, আণক, দেবদুন্দুভি, শংখ, বেণু বীণা প্রভৃতি বাদ্যের প্রচলন ছিল। বায়ুপুরাণে সঙ্গীত 'গান্ধর্ব' নামে পরিচিত ছিল। এই পুরাণে সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা, উনপঞ্চাশ প্রকারের তান, তিনশত গীতি, অলংকার এবং কয়েকপ্রকার বর্ণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। বায়ু পুরাণকার বলিয়াছেন—

চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয় মবরোহনম্
আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণ বিদো বিদুঃ॥

এই পুরাণে 'মদ্রক গীতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। লিঙ্গপুরাণে ভরতোক্ত গীত-রীতিকে অনুসরণ করা হইয়াছে। তাল, লয়, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি প্রভৃতি সকল সাঙ্গীতিক উপাদান সম্বলিত করিয়াই হরিনাম গান করা হইত।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সঙ্গীত বাদ্য, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতি শিল্পগত বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এখানে সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, বাইশ মূর্চ্ছনা, শৃঙ্গারাদি নব রস, দশ জাতি, উনপঞ্চাশ তান ও তিনটি বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে পরিচারিকা ও কিংকরসহ ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিনী এবং আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী বর্ণের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সময় হইতেই 'শ্রী' ও 'গান্ধার' রাগের জন্ম হয়। অগ্নিপুরাণে সঙ্গীতের ছন্দ, পদ, বৃত্তের বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তাঁহার 'সঙ্গীত রত্নাকর' নামক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে সঙ্গীতের বর্ণনায় তিনি বলেন 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং সঙ্গীতমুচ্যতে'। অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়েই সঙ্গীতের সৃষ্টি। তিনি সাতটি শুদ্ধ ও এগারটি বিকৃত স্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। স্বরগুলির শ্রুতি নিরূপণে তিনি বলিয়াছেন—

"চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়জ মধ্যম পঞ্চমাঃ
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রীঋষভধৈবতো"

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চমের চারিটি করিয়া, নিষাদ ও গান্ধারের দুইটি করিয়া এবং ঋষভ ও ধৈবতের তিনটি করিয়া শ্রুতি। এইরূপে বাইশটি শ্রুতিতে সাত স্বরের বিকাশ। তিনিও ভরতের মতানুযায়ী চারি প্রকার বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আঠারটি জাতি স্বীকৃত। জাতি ও জাতিরাগগুলি সামগান হইতে সৃষ্ট, জাতি হইতে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ হইতে অন্য রাগগুলি সৃষ্ট। গ্রামরাগের বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন—

"পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়াৎ"

অর্থাৎ ৫টি গ্রামরাগ যথাক্রমে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়া, বেসরা ও সাধারণী পাঁচটি গীতির আশ্রয়ভুক্ত। দেশী রাগের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"দেশে দেশে জননাং রুদরুচ্যা হৃদয় রঞ্জকম্
গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে"।

তিনি চৌষট্টি প্রকার রাগের বর্ণনায় তিরিশটি গ্রামরাগ, ৮টি উপরাগ, কুড়িটি রাগ, ৯৬টি ভাষারাগ, কুড়িটি বিভাষারাগ ও চারিটি অন্তরভাষা রাগকে মার্গ সঙ্গীতের অন্তর্গত রাখিয়া একুশটি রাগাঙ্গ, কুড়িটি ভাষাঙ্গ, পনেরটি ক্রিয়াঙ্গ এবং ত্রিশটি উপাঙ্গ দেশী রাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব নাদ, শ্রুতি, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, গ্রাম, মূর্ছনা, তান ও জাতিরাগ নির্ণয় করিয়া তাহাদের গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, তার, মন্দ্র, বহুত্ব, অল্পত্ব প্রভৃতি লক্ষণগুলি ও রাগগুলির রস ও ঋতুর বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

তাঁহার সময়ে স্বর ও রাগ আধুনিক স্বর ও রাগ হইতে ভিন্ন; কারণ ইহার শ্রুত্যন্তর বর্তমান হইতে পৃথক। রত্নাকরে শুদ্ধ ঠাঠকে 'মুখারী' বলা হইয়াছে[১]।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পণ্ডিত লোচন তাঁহার 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে ঠাট রাগ পদ্ধতি প্রকাশ করেন। তিনি ১২টি জনক রাগের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাগগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করেন। কাফী রাগকে শুদ্ধ মেল বা ঠাট বলা হইয়াছে। তিনি সাতটি শুদ্ধ ও বাইশটি শ্রুতির বর্ণনায় সা, ম ও প স্বরে চারিটি করিয়া, রে ও ধ স্বরে তিনটি করিয়া এবং গ ও নি স্বরে দুইটি করিয়া শ্রুতি নির্ধারণ করেন। অধিকন্তু তিনি স্বর-সংস্থান সংজ্ঞা প্রকরণটি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে রামামাত্যের 'স্বরমেল কলানিধি' নামক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে মুখারী, মালবগৌল, শ্রী, সারং, সারং নট, হিন্দোল, শুদ্ধ রামক্রিয়া, দেশাক্ষী, কাণ্ডগৌল, শুদ্ধ নাট, আহোরী তথা আহিরী, নাদ রামক্রী, শুদ্ধ বরালী, বসন্ত ভৈরবী, কেদার, গৌড়, হিজুজী, সামবরালী, রেবগুপ্ত, সামন্ত কাম্বোজী ইত্যাদি কুড়ি প্রকার মেলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মুখারীকে আদি ও শুদ্ধ মেল বলিয়াছেন এবং হিজুজী ও হিন্দোল বর্তমান কালের ভৈরব ও আশাবরী ঠাটের অনুরূপ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাতটি শুদ্ধ ও সাতটি বিকৃত স্বর নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রুতি, স্বর স্থাপনায় তিনিও ভরতকে অনুসরণ

১. সঙ্গীত প্রবীণ—নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার (১৯৬৫)—পৃ. ১২৬
২. ঐ পৃ. ১৩১

করিয়াছেন। রাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি গ্রহ, অংশ ও ন্যাস এই তিনটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অহোবল 'সঙ্গীত পারিজাত' নামক গ্রন্থে বর্তমান কাফীকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া বারটি স্বর এবং ১২২টি রাগের নাম এবং রাগগুলিকে মেল বা ঠাটের পরিবর্তে মূর্ছনার নির্দেশনায় নির্ধারিত করিয়াছেন। অহোবল তিনটি ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক কালের অপর পণ্ডিত সোমনাথ 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে রাগগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। মুখারী, রেবগুপ্তী, সামবরালী, তোড়ী, নাদ রামক্রী, ভৈরব, বসন্ত ভৈরবী, মালব গৌড়, রীতি গৌড়, আভীর নট, শুদ্ধ রামক্রী, শুদ্ধ বরাটী, শ্রী, কল্যাণ, কাম্বোজী, মল্লারী, সামন্ত কর্ণাট, গৌড়, দেশাক্ষী, শুদ্ধ নট এবং সারং নামক ২৩টি মেলের বর্ণনা দিয়াছেন। স্বরগুলির নামকরণে তিনি বলিয়াছেন যে শুদ্ধ ঋষভ, শুদ্ধ ধৈবত, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ নিষাদ, তীব্রতর ঋষভ, তীব্রতম ঋষভ, তীব্রতম ধৈবত, মৃদু মধ্যম, মৃদু পঞ্চম, মৃদু ষড়জ, কৈশিক নিষাদ, কাকলি নিষাদ, সাধারণ গান্ধার ও অন্তর গান্ধার।[২]

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা হৃদয় নারায়ণ দেব লোচনের গ্রন্থের প্রেরণায় 'হৃদয় কৌতুক' ও অহোবলের গ্রন্থের প্রেরণায় 'হৃদয় প্রকাশ' রচনা করেন। তিনি মেল বা ঠাটের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার গ্রন্থে তার লম্বাইয়ের উপর ১২টি স্বরস্থান নির্ণয় করিয়াছেন।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে নরপতিপুরের পার্শ্ববর্তী স্থানে পণ্ডিত শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "রাগ তত্ত্ব বিবোধ" নামক একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি প. অহোবলকে অনুসরণ করিয়া ১২টি স্বর স্থাপনার বিষয়ে নিজ মতের পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনিও শুদ্ধ ঠাট বর্তমান কালের কাফী ঠাটের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলায় যে গীতরূপের প্রচলন ছিল তাহা সম্ভবতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই অনুসরণ করিয়া গঠিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে তৎকালীন প্রচলিত জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই পরবর্তীকালে রাগরাগিনী রূপে প্রচারিত হয়। প্রাচীন ভারতে মাগধী গীতরীতিও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই গীতরীতি লুপ্ত হইয়া পাঁচ প্রকার গীতি যথা শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গীতিগুলি যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা গ্রামরাগ নামে পরিচিত।

শুদ্ধা গীতি—অবক্র ও ললিত স্বরযুক্ত।

ভিন্না গীতি—সূক্ষ্ম ও মধুর গমকযুক্ত।

বেসরা গীতি—আবেগপূর্ণ।

এই তিনটি গীতের সম্মিলিত রূপ সাধারণী এবং গোড়ী গীতিতে গমকের বিশেষ প্রয়োগ হইত। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন শ্রেণীতে রূপায়িত হইত। এই গোড়ী গীতিই সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত গীতের প্রধান রূপ। গৌড়বাসীদের নিকট এই গীত পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলিয়া এই গীতিকে গোড়ী গীত নামে অভিহিত করা হইত। ইহা তিনটি গ্রামরাগ আশ্রিত হইলেও পরবর্তীকালে গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, বিভাষা রাগ ও অন্তর ভাষা রাগের সৃষ্টি হয়। গ্রামরাগগুলিতে গৌড় বা বঙ্গালের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রাম রাগ	ভাষা রাগ
হিন্দোল	গোড়ী
মালবকৈশিক	বঙ্গালী

বঙ্গালী ভাষারাগের অংশ ও গ্রহ স্বর মধ্যম, ন্যাস স্বর ষড়জ। 'বৃহদ্দেশীতে' উল্লিখিত—

"বঙ্গাল দেশ সম্ভূতা বঙ্গালী দিব্য রূপিণী।"

গ্রামরাগ, রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ গান্ধর্ব গীতির শাখা উপশাখার মাঝেই গোড়ীয় গীত পদ্ধতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উপরন্তু কর্ণাট ও দ্রাবিড় গীত রীতির পদ্ধতির সঙ্গে বাঙ্গলার সঙ্গীত ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। গৌড় বঙ্গদেশে সংস্কৃতির আদান প্রদান বিষয়ে বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় শাসন বিধি ছিল না। ভারতবর্ষে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মাঝে প্রাচীনকাল হইতে এক বিবর্তন ধারা চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রচলিত। গীতগোবিন্দ রচনাকার জয়দেব, বঙ্গাধিপতি রাজা লক্ষণ সেনের যুগে সঙ্গীত ও সাহিত্যের মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল। সেই সময় সম্ভবত ভারতবর্ষে সঙ্গীতের মান খুবই উন্নত ধরণের ছিল, কারণ গীতগোবিন্দ কাব্যে শব্দের গঠন, ছন্দ, তাল, লয়, রাগরাগিনীর বিবরণ অতি উচ্চ পর্যায়ের ছিল। কাব্য ও সুরের অভিন্ন লীলা মানুষকে অমৃতসাগরে লইয়া যায়।

Song is inseparably connected with Poetry.

—Encyclopadia Britanica.

মানব মনের উদ্দীপনা, প্রীতি, নব রসের সঞ্চার লাভ করে উন্নত ধরণের কাব্য ও সুরের সমন্বয়ে। এই প্রসঙ্গে Plato বলিয়াছেন—

Music is a moral law. It gives a soul to the Universe, wings to the mind, flight to imagination, charms to sadness, gaiety and life to everything.

প্রাচীন ভারতবর্ষে তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় রূপ এক আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। সঙ্গীত সংহিতায় উল্লেখ আছে—

পূজা—কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটি গুণং জপঃ
জপাৎ কোটি গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।

নারদ সংহিতায়—

শ্রীভগবানুবাচ
নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ

সঙ্গীত রত্নাকর—

শ্রুতি স্মৃত্যাদি—সাহিত্য—নানাশাস্ত্রবিদোঽপি চ
সংগীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপদাঃ মৃগাঃ স্মৃতাঃ

যাগ্যবল্কস্মৃতি (৩/১১৫) ধৃত পাঠঃ

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ শ্রুতিজাতি বিশারদ
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিবচ্ছতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার রাগ, তাল ও যন্ত্রাদি

অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই সম্ভবত বাংলাদেশের সঙ্গীত শাস্ত্রে ভরতের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে পৌণ্ডবর্ধনের কার্ত্তিকেয় মন্দিরের সঙ্গীত অনুষ্ঠানগুলি ভরতানুগ অর্থাৎ ভরতের মত অনুযায়ী অনুসৃত হইত।

নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাগীতিতে ষোল প্রকার রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। যথা পটমঞ্জরী, গবড়া বা গৌরা, অরু, গুঞ্জরী বা কহ্নু গুঞ্জরী বা কাহ্নু গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, কামোদ, ধানসী, রামক্রী, বলাড্ডি বা বরাড়ী, শিবরী বা শবরী, মল্লারী, মালসী, গবুড়া, বঙ্গাল, ভৈরবী।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে কবি জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাগগুলির মধ্যে মালব, মালবগৌড়, গুর্জর বা গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, দেশ বরাড়ী, মধুমাধবী, ললিত, পঞ্চম, ধণ্যাসিক বা ধানসী, ভৈরব, গৌড়কৃত, দেশাখ বা দেবশাখ, মালবশ্রী, কেদার, নট, নন্দ, কর্ণাট, স্থান গৌড়, শ্রী, মল্লার, বরাটি, মেঘ, বঙ্গাল মরুকৃতি বা মারোবিকা (মারু) প্রভৃতি রাগগুলির নাম পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক গীতিকাব্যে নিম্নলিখিত রাগগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুর্জরী, সৌরী (সৌরাষ্ট্রী), দেশাগ, দেবশাখ, বরাড়ী, ভাটিয়ালী, মারহাঠা, কেদার, ধানশী বা ধানসী, কোড়া, পাহাড়িআ বা পাহাড়ী, বেলাবলী, মল্লার, বসন্ত, মালবশ্রী, শ্রী, সাহের, মালব, রামগিরি, দেশ বরাড়ি, বঙ্গাল, কহু, বিভাস, কহু, বঙ্গাল বরাড়ি, পটমঞ্জরী, সিন্ধোরা, কোড়া দেশ।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া বাংলাদেশে মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগীতি প্রচলিত ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি মল্লার, বসন্ত, শ্রী, কৈশিকী ও বোট্ট রাগে আবৃত্তির সুরে গাওয়া হইত। কিন্তু শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকরে' ছত্রিশ রকম বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে 'মঙ্গল' এক প্রকার প্রবন্ধ হিসাবে উল্লিখিত। এই প্রকার প্রবন্ধ নিবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রবন্ধের বর্ণনা নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া হইয়াছে।

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈ, পদৈঃ
বিলম্বিত লয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দমথবা ॥

অর্থাৎ ইহা কৈশিকী বা বোট্ট রাগে মঙ্গল ছন্দ অবলম্বনে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হইত। বোট্ট রাগ উৎসবে গাওয়া হইত বলিয়া প্রকাশ। বোট্ট রাগের অঙ্গরাগ হিসাবে মাঙ্গলী রাগের নাম পাওয়া যায়। তিন রকম পদে অর্থাৎ গদ্য, পদ্য এবং গদ্য পদ্যে মিশ্রিত কৈশিকী রাগে ও নিঃসার তালে স্বর সংযোগ করিয়া মঙ্গলাচার নামক এক প্রকার গীতের বিধি ছিল।

এই গীতরূপের তিনটি ভাগ যথাক্রমে উদ্গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ এবং স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ ও তাল নামে প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ ছিল। তেনক শব্দটি মঙ্গলবাচক। গানের প্রারম্ভে "ওং তৎ সৎ" এই ধরণের মঙ্গলসূচক শব্দ ধ্বনিকেই তেন বলা হইত। মঙ্গল গানের এইরূপ প্রচলিত গায়ন রীতি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিল। অনেকে মত পোষণ করিয়াছেন যে মঙ্গলকাব্য বা মঙ্গলগীতগুলি নাথ গীতি, চর্যা, দেশীয় সুরের উপাদান অর্থাৎ তাল, ছন্দ, লয়

মিশ্রিত গায়নরীতি নীতিকে অনুসরণ করিয়া রূপায়িত করা হইয়াছে। মঙ্গল গানে ছড়ার পরিবর্তে গান, পয়ার ও আবৃত্তির সমাবেশের কথা জানা যায় এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগেও গাওয়া হয়। অতি প্রাচীনকালে ঈশ্বরের আরাধনায় দু-চার পদে স্তব স্তুতিতে সাধারণ সুরের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ দেশের আভ্যন্তরীণ, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষের চেতনা নূতন নূতন সৃষ্টির পথে ধাবিত হয় এবং রাজ অনুকূলের সহযোগিতায় মঙ্গল গান ছড়ার আকার হইতে কাব্যে রূপান্তরিত হয়। ফলে ইহার গীতরূপ অনেকাংশে হ্রাস পায়। বর্তমানে মঙ্গলকাব্যের যে কাব্যরূপ পাওয়া যায়, তাহাতে রাগরাগিনী ও তালের বিশেষ উচ্চাঙ্গ গীতরূপ পাওয়া সম্ভব হয় না।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত কীর্তন গানের প্রচলন দেখা যায়। কীর্তন গানে নানাবিধ রাগরাগিণীর সমাবেশ হইয়াছে এবং বর্তমান কালের বহু রাগরাগিণীর সমাবেশও কীর্তন গানে বিশেষ আকর্ষণীয়ভাবে পাওয়া যায়, যথা মল্লার, ভৈরব, কেদার, গৌরী, পঞ্চম, সিন্ধুরা, বিভাস, বরাড়ী, তোড়ী, খাম্বাবতী, নট, ধানসী, শ্রী, সুহৈ, বেলাবলী, ললিত, ককুভ, গোণ্ডকিরি প্রভৃতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় ব্যবহৃত তাল

গীতগোবিন্দ—আদি, অষ্টতাল, নিঃসার, যতি, লঘু, আদি, ঝম্পক, অট, একতালী, প্রতিমণ্ঠ, অড্ড, দ্রুতমণ্ঠ, তৃতীয় তাল বা ত্রিতাল, রূপক, প্রতি, ত্রিপুটক বা ত্রিপুট, জয়শ্রী, জয়মঙ্গল বা বিজয়ানন্দ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—একতালী, লগ্নক, রূপক, যতি ক্রীড়া, লঘুশেখর, কুড়ুক, আটতালা।

মঙ্গলকাব্য—নিঃসার।

কীর্ত্তন—একতালী, আদি, নিঃসার, ত্রিপুট, সমতাল, রূপক, যতি, ঝম্পক, বীরবিক্রম, অড্ড, চঞ্চৎপুট, মণ্ঠ, দশকুশী, তেওট, মধ্যমান, আড়াঠেকা, আড়খেমটা, গড়খেমটা ইত্যাদি।[১]

১. বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য—ডঃ বাসন্তী চৌধুরী (১৯৬৮)—পৃ. ১১৮

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা

বাদ্য সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আনদ্ধ (চর্মাচ্ছাদিত যন্ত্র), সুষির (ফুঁকার সহযোগে ব্যবহৃত), ঘন (তাম্র নির্মিত) এবং তত বাদ্য (তারের যন্ত্রাদি)।

আনদ্ধ শ্রেণী—দুন্দুভি, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, বীরঢাক, পটহ, দগড়, ডমরু, কাড়া, পাখোয়াজ, ডম্ফ, মুরজ, ভেরি, আনক, পড় (পটহ), দড়মসা, ঢাক, ঢোল, মর্দল, টনক, জগঝম্পা, মোড়া, দামা, খঞ্জরী প্রভৃতি।

সুষির শ্রেণী—সানাই, কাহাল, শংখ, শিঙ্গা, মুহরী, উপাঙ্গ, বিষাণ, তুরি, বেণু, ভুরঙ্গ, করণাল প্রভৃতি।

ঘন—মন্দিরা, ঘণ্টা, ঝাঝর, কাঁসি প্রভৃতি।

তত—রবাব, সাতস্বরা, রুদ্রবীণা, কপিলাস, মধুস্রবা, যন্ত্র, খমক, দোতারা, সেতার, পিণাক, বল্লকী।[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত রাগ রাগিনীর পর্যালোচনা

মালব—মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' নামক গ্রন্থে (৫ম-৭ম শতক) মালব রাগের নাম পাওয়া যায়। এই রাগ টক্ককৌশিক হইতে সৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত। ধৈবত-গ্রহ ও ন্যাস এবং ষড়জ ও ঋষভ স্বর সম্বাদ। সম্পূর্ণ জাতি, দেশী রাগ। "সঙ্গীত মকরন্দে" এই রাগকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলা হইয়াছে। শার্ঙ্গদেব এই রাগকে টক্ক কৌশিকের ভাষা বা জন্য রাগ বলিয়া ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, ষড়জ ও ধৈবতের এবং ঋষভ ও পঞ্চমের মধ্যে স্বর সঙ্গতির সূত্র নির্ধারণ করিয়াছেন। এই রাগ মালব জাতির অবদান বলিয়া স্বীকৃত। লোচনের মতে এই রাগ গৌরী সংস্থানের (বর্তমানে ভৈরব ঠাট) অধীনে রাখা হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত হৃদয় নারায়ণ দেব এই রাগের প্রসঙ্গে নিম্নভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—

স গ ম প সং রে়্ সং ন দ প

স ম গ রে়্ স নি় স

পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' মালব রাগকে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত ঔড়ব জাতির রাগ বা রাগিনী বলিয়াছেন। শুদ্ধ নিষাদ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস।

---

১. প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৭১)—পৃ. ৯১

আরোহণে—নি সা গ ম ধ

অবরোহণে—ধ ম গ সা নি

কিন্তু বর্তমানে এই রাগকে পূর্বী মেলের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।[১] আরোহণে নি ও অবরোহণে ধ দুর্বল করিয়া ষাড়ব-ষাড়ব জাতির রাগ রূপে গণ্য করা হয়। এই রাগে বাদী রে, সমবাদী প, সন্ধ্যাকালে গাওয়া হয়। কোমল রে ও ধ, গ - প, নি ম স্বর সঙ্গীত।

বসন্ত—একাদশ শতকে পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সার' নামক গ্রন্থে বসন্ত রাগে রে ও ধ বর্জিত করিয়া ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচ স্বরের রাগ বলিয়া উল্লেখ করেন। 'সঙ্গীত মকরন্দে' এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়া প্রকাশিত এবং ইহা প্রাতঃকালে গেয়। 'মানসোল্লাসে' (১২শ-১৩শ শতক) ইহাকে জনক রাগ বলা হইয়াছে এবং ইহা হিন্দোল হইতে উদ্ভূত সম্পূর্ণ জাতির রাগ।

'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থে বসন্তকে শুদ্ধ বসন্ত গণ্য করা হইয়াছে এবং আরোহণে পঞ্চম বর্জিত করিয়া ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এই গ্রন্থে মুখারী আদি ও শুদ্ধ মেল বলিয়া প্রকাশিত। রামামাত্য কালের শুদ্ধ রে ও শুদ্ধ ধ বর্তমান কালে কোমল রে ও কোমল গ এবং শুদ্ধ গ ও শুদ্ধ নি বর্তমান কালের শুদ্ধ রে ও শুদ্ধ ধ বুঝায়। পণ্ডিত সোমনাথ রামামাত্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে ইহাকে গৌরী সংস্থানের রাগ অর্থাৎ বর্তমান ভৈরব ঠাটের রাগ বলা হইয়াছে। 'হৃদয় কৌতুকে' নিম্নরূপে ইহার রাগরূপ দেখান হয়।

সা ম র্সা ন দ প ম গ ঋ সা

'গীত সূত্রসার' নামক গ্রন্থে ইহাকে ষাড়ব জাতীয় রাগ বলা হইয়াছে। ইহাতে রে কোমল, দুই মধ্যম, প বর্জিত স্বর এবং ইহা রাত্রি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে পূরবী ঠাটের অন্তর্গত করিয়া পঞ্চম মহত্বপূর্ণ স্বর হিসাবে সূচিত হয়। 'সঙ্গীত পারিজাত' নামক গ্রন্থে এই রাগে গ ও নি তীব্র, ষড়জ গ্রহ এবং মধ্যম বাদী স্বর হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

গুর্জরী—গুর্জর রাজ্যের (বর্তমান গুজরাট) দেশজ রাগ অথবা গুর্জর জাতির নিজস্ব সুরের রূপান্তর বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। মতঙ্গ টক্ক রাগের জন্য রাগ গুর্জরীকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়াছেন।

---

১. রাগ নির্ণয় (২য় খণ্ড) (১৩৬৮)—রবীন্দ্রলাল রায়, পৃ. ৯০

নি, রে ও সা স্বরগুলিতে ন্যাস করা হয়। পুনরায় তিনি ইহাকে মালবকৈশিকের জন্য রাগ বলিয়াছেন। নি অংশ, সা ন্যাস, নি ও রে এবং ম ও রে স্বর সম্বাদ। সম্পূর্ণ জাতি। পুনরায় তিনি ইহাকে পঞ্চমের জন্য রাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত লোচনের মতে ইহা গৌরী মেলের (বর্তমান ভৈরব মেল) রাগ, সুতরাং ইহাতে রে ও ধ কোমল। 'হৃদয় কৌতুকে' নিম্নরূপে এই রাগের বর্ণনা লক্ষণীয়।

সা গ প দ র্সা

র্সা দ প গ ম সা

বর্তমানে তোড়ী মেলের অন্তর্গত এই রাগে পঞ্চম বর্জিত করিয়া ষাড়ব জাতির রাগ বলিয়া স্বীকৃত। রে, গ ও ধ কোমল। তীব্র ম, বাদী ধ ও সম্বাদী কোমল রে।

কর্ণাট—লোচনের মতে কর্ণাট রাগ খাম্বাজ মেলের অন্তর্গত এবং এই রাগে কোমল নি ও বাদী স্বর শুদ্ধ বলিয়া জানা যায়।[১] সম্রাট আকবরের সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুণ্ডরীক বীটঠল কর্ণাট রাগে রে ও ধ বর্জিত করিয়া ঔড়ব বা পাঁচ স্বরের রাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আবার কখনও ইহাতে সাত স্বরের সমাবেশও করিয়াছেন। সঙ্গীত দর্পণকার পণ্ডিত দামোদরের মতে ইহা সাত স্বরের রাগ, নিষাদ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। কোমল নিষাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) 'রাগ বিবোধ' গ্রন্থে কর্ণাটের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহা সম্পূর্ণ জাতির রাগ, তার ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং সন্ধ্যায় পরিবেশন করা হয়। 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে কানাড়া রাগে তীব্র গান্ধার যুক্ত মধ্যম উদ্গ্রাহ, ধৈবত ন্যাস ও ষড়জ অংশ স্বর বলা হইয়াছে। এই রাগ সম্ভবতঃ কর্ণাট দেশের প্রচলিত দেশী সুরের রূপান্তর। এই রাগের রূপের বর্ণনা নিম্নভাবে 'হৃদয় কৌতুক' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

স গ ম ম গ রে স

নি় স র স র গ র স

স স স স র স ন় স

স স স র স

ন ধ প ম ম ম প ম প ধ

ন র্স ধ প ম ম গ র স

১. পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস—প্রথম সংস্করণ ১৩৭০—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃ. ৯৫

গ, ধ ও নি কোমল এবং জাতি সম্পূর্ণ। 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'গীত সূত্রসার' গ্রন্থে বর্ণিত এই রাগ রাত্রি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। বর্তমানে ইহা আশাবরী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত। বাদী রে ও সমবাদী প, সম্পূর্ণ-ষাড়ব জাতি। মধ্যরাত্রে পরিবেশন করা হয়। আরোহণে গ আন্দোলিত এবং অবরোহণে ধ বর্জিত।

গোণ্ডকিরি—এই রাগ সময় বিশেষে গুণকৃতি, গুর্ণকিরি, গুণকরী, গুণ্ডক্রী, গুণ্ডকোরী বা গুর্ণ্ডকিরী, গুণকালী, গুণক্রী ও গুণকেলী প্রভৃতি নামে পরিচিত। পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময়সার' নামক গ্রন্থে ইহা সম্ভবতঃ প্রথম উল্লিখিত। তদানীন্তনকালে ইহা হাস্য ও শৃঙ্গার রসাত্মক ছিল বলিয়া প্রকাশ। 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থে এই রাগ গান্ধার বর্জিত ষাড়ব জাতীয় এবং মালব রাগের পত্নীরূপে মান্য করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সোমেশ্বর দেব তাঁহার 'মানসোল্লাস' নামক গ্রন্থে এই রাগকে ভৈরব রাগের জন্য রাগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ষোড়শ শতকে পুণ্ডরীক বীঠঠল এবং পণ্ডিত রামামাত্য এই রাগে ধৈবত বর্জিত বলিয়া ষাড়ব জাতির রাগ নামে মত প্রকাশ করেন এবং ইহা গৌড়ী সংস্থানের রাগ। সপ্তদশ শতকে পণ্ডিত সোমনাথ ইহাকে কোমল রে, ধ যুক্ত গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত ঔড়ব জাতির রাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাগ গৌড়ী সংস্থানের (বর্তমান ভৈরব মেল) রাগ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার নাম গুণকেলী; ইহাতে রে ও ধ কোমল ব্যবহৃত হয়। এই রাগের বর্ণনা 'হৃদয় কৌতুক' গ্রন্থে নিম্নভাবে পাওয়া যায়।

স ঋ ঋ ম ম প

প স স স ণ দ প

ম ম ঋ স স ঋ ম ঋ স।

বরাড়ী—সম্ভবতঃ মহাভারতের মৎস্যদেশের রাজধানী বিরাট নগরের নিজস্ব সুর হইতে কালক্রমে বরাটিল, বরাটিকা, বৈরাটি, বিরাটি ও বরাড়ী রাগ সৃষ্ট। সুতরাং ইহা দেশজাত দেশী রাগ। মতঙ্গ এই রাগে রে দুর্বল করিয়া মধ্যমকে অংশ ও বাদী এবং ধৈবত ন্যাস বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। পণ্ডিত পার্শ্বদেব তাঁহার 'সঙ্গীত সময়সার' গ্রন্থে ইহাকে ধৈবত বাদী এবং ষড়জ গ্রহ ও ন্যাস বলিয়াছেন এবং ইহা শৃঙ্গার রসাত্মক। পার্শ্বদেব এই রাগে ধৈবত ন্যাস, মধ্যম অংশ বা বাদী এবং দুর্বল বলিয়া বর্জিত রাখিয়াছেন। পণ্ডিত অহোবল এই রাগে কোমল রে ও ধ এবং শুদ্ধ গ ও নিষাদের

ব্যবহার নির্ধারণ করিয়াছেন। অধিকন্তু মধ্যম স্বর তীব্রতর ও গমকযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

পণ্ডিত দামোদর তাঁহার 'সঙ্গীত দর্পণ' নামক গ্রন্থে এই রাগে ষড়জকে গ্রহ, অংশ ও ন্যাস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ। বর্তমানেও এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির এবং মারবা মেলের অন্তর্গত। গান্ধার ও ধৈবত এই রাগের বাদী ও সমবাদী। ইহাতে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং সন্ধ্যাকালে গীত হয়। মতান্তরে কেহ কেহ ইহাতে ধৈবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দেশাখ—বিভিন্ন সময়ে ইহা দেশাখ্য, দেশাখ, দেশাখ্যা, দেশাক্ষী, দেবশাখ, দেওশাখ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। পণ্ডিত লোচনের মতে দেশাখ মেঘ সংস্থানের রাগ অর্থাৎ এই রাগ বর্তমান কালের বৃন্দাবনী সারং-য়ের রূপানুযায়ী গাওয়া হইত। অবশ্য তদানীন্তকালে সারং রাগে গান্ধার বর্জিত ছিল না। হনুমন্ত মতে দেশাখ্য বা দেশাখ হিন্দোল রাগের তৃতীয় রাগিনী, পার্শ্বদেব এই রাগে রে বর্জিত করিয়া ষাড়ব জাতির রাগ হিসাবে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু হৃদয় কৌতুকে নিম্নভাবে এই রাগের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

স র ম প ম স ণ দ ম

প র গ ম র স

চতুর্দশ শতকে দেশাখ্য বা দেবশাখ রাগে পঞ্চম বর্জিত করিয়া ষাড়ব জাতির অন্তর্গত থাকিলেও পণ্ডিত রামামাত্য এই রাগের আরোহণে সম্পূর্ণ এবং অবরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত সোমনাথ ইহাকে ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়াছেন। কবি জয়দেব সম্ভবত কল্লিনাথের মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বর্তমানে ইহা ধৈবত বর্জিত, ষাড়ব জাতীয় রাগ হিসাবে পরিচিত। পঞ্চম ও ষড়জ ইহার বাদী ও সমবাদী। মতান্তরে মধ্যম বর্জিত এবং প্রাতঃকালীন দ্বিপ্রহরে গীত হয়।

দেশ বরাড়ী—সম্ভবতঃ এই রাগ দেশ ও বরাড়ী রাগের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। কবি জয়দেব তাঁহার গীত রচনায় এই রাগের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

গৌড়ী—মতঙ্গ তাঁহার 'বৃহদ্দেশী' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন 'গৌড়ীয় কথ্যতে রীতি'। সুতরাং এই রাগ বাংলাদেশের সংস্কৃতি মণ্ডিত হইবে। পার্শ্বদেবও

'সঙ্গীত সময়সারে' বলিয়াছেন "গৌড়ীয় দেশ চপ হীনো"। গৌড় বা গৌড়ী রাগাঙ্গ শ্রেণীভুক্ত এবং পঞ্চম বর্জিত ষাড়ব জাতীয় রাগ ছিল। 'সঙ্গীত মকরন্দে' ইহাকে মালব রাগের জন্য রাগ এবং 'রাগতরঙ্গিণী' ও 'সঙ্গীত পারিজাত' নামক গ্রন্থে গৌড়ী মেল অর্থাৎ বর্তমান ভৈরব মেলের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই রাগে রে ও ধ কোমল এবং গ ও নি শুদ্ধ। বর্তমানে ভৈরব ও পূরবী উভয় মেলেই ব্যবহৃত হইতেছে। আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত এবং অবরোহণে সকল স্বর ব্যবহৃত হওয়ায় এই রাগ ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত। রে ও প বাদী সমবাদী। কেহ কেহ এই রাগে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করেন। পূর্বী মেলের মতাবলম্বী গৌড়ীকে আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার বর্জিত ও ধৈবত বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

মল্লারী—"মল্লারী গ হীণা"। সুতরাং পার্শ্বদেবের সময়ে ইহা দুই স্বরে লীলায়িত ছিল। 'সঙ্গীত সময়সারে' মধ্যম স্বর অংশ ও গ্রহ, শৃঙ্গার রসাত্মক। এই রাগ মন্দ্র সপ্তকের ঋষভ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সোমেশ্বরের 'মানসোল্লাসে' মল্লারীকে মেঘ রাগের জন্য রাগ বলা হইয়াছে। পণ্ডিত রামামাত্যের 'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থে মল্হারীকে গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত ঔড়ব জাতির রাগ বলিয়াছেন। ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পণ্ডিত অহোবল 'সঙ্গীত পারিজাতে' বলিয়াছেন মল্লারী মেঘ রাগের অভিন্ন। গ ও নি বর্জিত ছিল। জাতি ঔড়ব। পণ্ডিত সোমনাথ 'রাগ বিবোধে' মল্লারীকে মেল রাগ ও উত্তমশ্রেণীর রাগ বলিয়াছেন। শ্রীনিবাস সঙ্গীত পারিজাতকে অনুসরণ করিয়াছেন; বর্তমানে মল্লারী লুপ্ত; মল্লার মেঘ মল্লার হিসাবে নির্ধারিত। অহোবলের সময়ে মল্লার ছিল গৌরী মেলাশ্রিত (বর্তমান ভৈরব মেল); ঔড়ব-ষাড়ব জাতির রাগ, আরোহণে গ ও নি এবং অবরোহণে গান্ধার বর্জিত। রে ও ধ কোমল। পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' মল্লারী বা মল্লার ঔড়ব ঔড়ব জাতির রাগ বলিয়াছেন এবং ইহাতে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত। শার্ঙ্গদেবও বলিয়াছেন 'মলহার: ষড়জ পঞ্চম বর্জিতঃ'। পণ্ডিত দামোদর এই রাগে ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপরদিকে দেখা যায় শার্ঙ্গদেব মলহারে পঞ্চম স্বরকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে এই রাগ কাফী মেলাশ্রিত, মতান্তরে খাম্বাজ: রে ও প স্বর যথাক্রমে বাদী ও সমবাদী। আরোহণে গ ও নি এবং অবরোহণে গ বর্জিত হওয়ায় ঔড়ব

ষাড়ব জাতির রাগ বলিয়া স্বীকৃত। খাম্বাজ ঠাটের মতাবলম্বীগণ আরোহণে ও অবরোহণে গ ও নি বর্জিত হওয়ায় ঔড়ব জাতীয় রাগ বলিয়া মানা করেন। বাদী ম সমবাদী সা। বাংলার শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁহার 'সঙ্গীত সময়সার' নামক গ্রন্থে মেঘ ও মল্লারকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন মেঘ রাগে ধৈবত বর্জিত হওয়ায় ষাড়ব জাতির এবং মল্লারে আরোহণে শুদ্ধ নি ও অবরোহণে কোমল নিষাদের ব্যবহার হয়।

কেদার—সম্ভবতঃ এই রাগ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হয়। 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে এই রাগ কেদার সংস্থান, বর্তমান বিলাবল মেলের অন্তর্গত এবং সাত স্বরই শুদ্ধ। মতান্তরে অধুনা ইহা কল্যাণ মেলের অন্তর্গত করিয়া ব্যবহৃত হয়। উভয় মধ্যমের ব্যবহার এবং প্রথম প্রহরে পরিবেশনের জন্য নির্দেশিত। বাদী শুদ্ধ মধ্যম, সম্বাদী সা।

ধানেশ্রী—সময় বিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা ধানশ্রী, ধানেশ্রী, ধনাশ্রী, ধন্যাসী, ধন্যাসিকা, ধন্যাশ্রী, ধনাসিরী, ধনসী। পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সারে' এই রাগে রে বর্জিত রাগাঙ্গ ষাড়ব শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামামাত্য 'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থে ইহাতে রে ও ধ বর্জিত করিয়া ঔড়ব জাতির রাগ, ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং প্রাতঃকালে গেয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। 'সঙ্গীত পারিজাত' ও 'রাগ তত্ত্ববিবোধে' তিন প্রকার ধনাশ্রী নির্দেশিত হইয়াছে।

প্রথমটি শুদ্ধ মেল বর্তমান কাফী ঠাট। দ্বিতীয়টি ধৈবত বর্জিত এবং তৃতীয়টিতে রে ও ধ বর্জিত অর্থাৎ বর্তমানে 'ধানী'র রূপানুযায়ী। রাগ তরঙ্গিনীতে ধনাশ্রী মেল বর্তমান পূরবী মেলের ন্যায় হইলেও তৎকালে কোমল মধ্যমের ব্যবহার ছিল না; বর্তমানে এই রাগ পূরিয়া ধানেশ্রী রাগের ন্যায় পরিবেশিত হয়। 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থ মতে বর্তমান প্রচলিত শ্রী রাগের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির, দিবা চতুর্থ প্রহরে গেয়। এই রাগে রে ও ধ কোমল, কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

কামোদ—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে এই রাগের প্রচলন হয়। নবম শতাব্দীতে পার্শ্বদেব ভাষাঙ্গ শ্রেণীর আদি কামোদই কামোদ রাগের আদি রূপ বলিয়া মনে করেন। 'সঙ্গীত রত্নাকরে' শার্ঙ্গদেব এই রাগে ধৈবত অংশ, ষড়জ ন্যাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সপ্তদশে 'রাগ তরঙ্গিনীতে' এই রাগকে কর্ণাট সংস্থানের জন্য রাগ বলা হইয়াছে। 'সঙ্গীত দর্পণে' পণ্ডিত

দামোদর এই রাগকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়াছেন। ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর রচিত 'কণ্ঠ কৌমুদী' এবং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে কামোদ রাগে কোমল নি, সম্পূর্ণ জাতি ও রাত্রি প্রথম প্রহরে গীত হয় বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত। কোমল নি বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহৃত হয় এবং গান্ধার ও নিষাদ বক্র। বাদী গ ও সম্বাদী সা, উভয় মধ্যমের ব্যবহার স্বীকৃত এবং রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়। সম্পূর্ণ জাতি।

ললিত—মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশীতে' এই রাগকে টক্ক রাগের ভাষা বা জন্য রাগ বলা হইয়াছে। প্রাচীনকালে ইহাকে ললিত বলা হইত। এই রাগের গ্রহ ও ন্যাস ষড়জ—পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সারে' এই রাগকে ভাষাঙ্গ রাগ বলিয়াছেন এবং প ও রে বর্জিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে সোমেশ্বর দেব এই রাগকে বসন্ত রাগের জন্য রাগ এবং পণ্ডিত লোচন 'রাগ তরঙ্গিনীতে' ধনাশ্রী সংস্থানের জন্য রাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত রামামাত্য 'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থে ইহাকে প বর্জিত ষাড়ব জাতির রাগ বলিয়াছেন। ইহাতে ষড়জ গ্রহ ও ন্যাস এবং প্রথম প্রহরে ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। পণ্ডিত অহোবল ও পণ্ডিত রামামাত্য একই মতাবলম্বী ছিলেন। 'সঙ্গীত দর্পণে' পণ্ডিত দামোদর এই রাগকে রে ও প বর্জিত ঔড়ব জাতির রাগ বলিয়াছেন। ষড়জ গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'কণ্ঠ কৌমুদী' নামক গ্রন্থে রে কোমল, কড়ি মধ্যম ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে ইহা ষাড়ব জাতির রাগ এবং পঞ্চম বর্জিত করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে।

কানাড়া—পণ্ডিত সোমনাথ ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে 'রাগ বিবোধে' কর্ণাটের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ। তার ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এই রাগ সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয়। 'সঙ্গীত পারিজাতে' কানাড়া তীব্র গান্ধারযুক্ত। মধ্যম উদগ্রাহ, ধৈবতে ন্যাস ও ষড়জকে অংশ বলা হইয়াছে। সপ্তদশে পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' সম্পূর্ণ জাতির রাগ, নিষাদ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং ইহা কর্ণাট দেশের প্রচলিত দেশী আদিম সুর হইতে রূপান্তরিত। গ, ধ ও নি কোমল, সম্পূর্ণ জাতির রাগ হিসাবে 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'গীত সূত্রসার' গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত। এই রাগ রাত্রি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। বর্তমানে এই রাগ আশাবরী মেলের অন্তর্গত।

বাদী রে, সমবাদী প ও সম্পূর্ণ-ষাড়ব জাতি। মধ্যরাত্রে গীত হয় এবং এই রাগের আরোহণে গ আন্দোলিত ও অবরোহণে ধ বর্জিত বলিয়া প্রচার চলিতেছে।

বাঙ্গালী—পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সারে' সম্পূর্ণ জাতির রাগাঙ্গ বলিয়াছেন। এই রাগ দেশ জাত। "বঙ্গাল দেশ সমভূতা বঙ্গালী দিব্যরূপিনী"। ধৈবত গ্রহ ও ন্যাস স্বর। ধৈবত বা নিষাদ সমবাদী, সম্পূর্ণ জাতি। কিন্তু পার্শ্বদেব এই রাগে মধ্যম অংশ বা বাদী ও ন্যাস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে বঙ্গালী ভিন্ন ষড়জ রাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ধৈবত গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। রে ও মধ্যমের ব্যবহার অধিক। পণ্ডিত কল্লিনাথ এই রাগকে মালব কৈশিকের ভাষাংগ বলিয়াছেন। সা ন্যাস স্বর। মধ্যম অংশ ও গ্রহ, রে ও নি সম্বাদী। সম্পূর্ণ জাতি। পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ শতাব্দী) বলেন এই রাগে রে ও ধ বর্জিত এবং ইহা ঔড়ব জাতির রাগ। ষড়জ গ্রহ ও বাদী এবং সমবাদী সা। পণ্ডিত দামোদর 'পারিজাত' গ্রন্থকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'গীত সূত্রসার' উভয় গ্রন্থে রে ও ধ কোমল। সম্পূর্ণ জাতি এবং দিবা প্রথম প্রহরে গেয় বলিয়া নির্দেশিত। বর্তমানে এই রাগ ভৈরব মেলাশ্রিত। নি বর্জিত ষাড়ব জাতির রাগ। রে ও ধ কোমল। বাদী ধ ও রে সমবাদী। অবরোহণে গ বক্র।

আরোহণ—সা রে গ ম প ধ র্সা

অবরোহণ—র্সা ধ প ম গ রে সা

গোণ্ড—পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময়সারে' (সপ্তম শতাব্দী) সম্ভবতঃ এই রাগের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাগ রাগাঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পণ্ডিত সোমনাথ এই রাগকে মেলরাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' এই রাগের বাদী মধ্যম বলিয়া প্রকাশ করেন। 'সঙ্গীত পারিজাত' কোমল রে, গান্ধার অংশ, ধৈবত ন্যাস; ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। 'কণ্ঠ কৌমুদী' গ্রন্থে রে, গ, ধ ও নি কোমল, কড়ি মধ্যম এবং সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়া বর্ণিত। বাদী ধৈবত, সম্বাদী গ, দিবা দ্বি-প্রহরে গেয় ও উত্তরাংগ প্রধান রাগ বলিয়া প্রকাশিত।

মেঘ—১৩০০ শতাব্দীতে 'সঙ্গীত মকরন্দে' মেঘ রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সোমেশ্বরদেব 'মানসোল্লাসে' মেঘ রাগকে জনক রাগ বলিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব মেঘ রাগে ধৈবতকে অংশ, ন্যাস ও গ্রহ স্বর বলিয়াছেন। পণ্ডিত অহোবল

মেঘ ও মল্লারকে অভিন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, অধিকন্তু গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত করিয়া তিনি এই রাগ ঔড়ব জাতির এবং ত্রি-সপ্তকে ইহার গতিবিধি বলিয়া উল্লেখ করেন, এই রাগ বর্ষাকালে গাইবার রীতি। পণ্ডিত সোমনাথ 'রাগবিবোধে' পণ্ডিত অহোবলকেই অনুসরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত লোচন এই মর্মে পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারকে মান্যতা দিয়াছেন। হৃদয় নারায়ণদেব তাঁহার 'হৃদয় কৌতুক' গ্রন্থে লোচনের মতানুযায়ী ইহাকে মেঘ সংস্থানের জন্য রাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত দামোদর বলেন মেঘ সম্পূর্ণ জাতির রাগ এবং ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। 'গীত সূত্রসারে' জানা যায় ইহা যাড়ব জাতির রাগ। ইহাতে ধ বর্জিত, সব স্বর শুদ্ধ এবং রাত্রি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়। বর্তমানে এই রাগ কাফী মেলাশ্রিত ; ষড়জ বাদী, পঞ্চম মতান্তরে মধ্যম সমবাদী।

রামক্রী—রামক্রী রাগ বিভিন্ন সময়ে রামকলি, রামকৃতী, রামকিরি, রামকরী, রামক্রিয়া, রামকেলী প্রভৃতি বহু নামে আখ্যায়িত। প্রথমাবস্থায় পার্শ্বদেব এই রাগে ঋষভ বর্জিত বলিয়াছেন, পরবর্তীকালে ইহাতে পঞ্চম বর্জিত যাড়ব জাতির রাগ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ষড়জ ন্যাস, মধ্যম অংশ ও বাদী, পঞ্চম বর্জিত। 'সঙ্গীত মকরন্দে' ইহাকে প্রাতঃকালীন রাগ ও সম্পূর্ণ জাতীয় পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত করিয়া ঔড়ব জাতির রাগ বলিয়া স্বীকৃত হয়। সোমেশ্বর দেব 'মানসোল্লাসে' ইহাকে ভৈরব রাগের জন্য রাগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল এই রাগে রে ও ধ কোমল তীব্র মধ্যম, তীব্র গ ও নিষাদের ব্যবহার এবং আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত করিয়া ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। পঞ্চম অংশ হিসাবে গণ্য হইত এবং প্রাতঃকাল ইহার ব্যবহার বিধেয় ছিল। সপ্তদশে পণ্ডিত সোমনাথ ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলেন। ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া গণ্য করেন। রামক্রী বর্তমানে রামকেলী নামেই পরিচিত। 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে এই রাগ ভৈরবী মেলের অন্তর্গত। কিন্তু নিম্নরূপে 'হৃদয় কৌতুকে' পাওয়া যায়।

স গ প দ স

ন দ প, গ ম গ ঋ স

'গীত সূত্রসার' গ্রন্থে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ, দিবা প্রথম প্রহরে গেয়, রে ও ধ কোমল এবং দুই নি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই রাগে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার হইয়া থাকে।

পটমঞ্জরী—সর্বপ্রথম 'সঙ্গীত মকরন্দে' (একাদশ শতক) এই রাগটির নাম পাওয়া যায় এবং পূর্বে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে পণ্ডিত লোচন ইহাকে সারং সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' এই রাগকে সম্পূর্ণ জাতির এবং পঞ্চম স্বরকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমানে ইহা কাফী মেলাশ্রিত। মতান্তরে ইহা বেলাবল মেলের অন্তর্গত বলিয়াও স্বীকৃত। কাফী মেলের অনুসারীগণ ইহার বাদী ও সমবাদী হিসাবে ষড়জ ও পঞ্চমকে মান্য করেন। আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার দুর্বল।

নট—পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময়সারে' নট রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গীত মকরন্দে নট রাগকে জনক রাগ এবং সম্পূর্ণ জাতির বলা হইয়াছে। সঙ্গীত রত্নাকরে এই রাগ সৌবীরী রাগের ভাষা বা জন্য রাগ বলিয়া ধরা হয়। ইহাতে ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' এই রাগকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ এবং তার ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন। বর্তমানে ইহা বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত; অবরোহণে গ ও ধ বক্র; মতান্তরে অবরোহণে ইহাতে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে এই রাগ গাহিবার নিয়ম এবং ইহার বাদী ও সমবাদী হিসাবে মধ্যম ও ষড়জকে গণ্য করা হয়।

মালব গৌড়—ইহা পূর্বে গৌড়ী মেল জাত ছিল, বর্তমানে ভৈরবী মেলের অন্তর্গত এবং ইহাতে কড়ি মধ্যম ব্যবহৃত হয়। পণ্ডিত হৃদয় নারায়ণ দেব মালব ও গৌড় দুইটিকে পৃথকভাবে ভৈরব ঠাটের রূপ বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

ভৈরবী--খৃষ্টীয় নবম-একাদশ শতকে পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সারে' ভৈরবী রাগে ধৈবতকে বাদী স্বর হিসাবে গ্রহণ করেন। ইহা সাত স্বর বিশিষ্ট এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসী ভিরবা জাতির প্রচলিত সুরে সুরাশ্রিত। ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকরে' একই মত পোষণ করিয়াছেন। ১৭শ শতকে পণ্ডিত অহোবল ইহার বাদী ষড়জ ও সমবাদী পঞ্চম বলিয়াছেন। পণ্ডিত দামোদর ও লোচন ভৈরবীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত লোচন ভৈরবীকে শুদ্ধ ঠাট অর্থাৎ বর্তমান-কালের কাফী বলিয়াছেন। হৃদয় নারায়ণ দেব পূর্বসূরীকেই অনুসরণ করেন। ১৭শ শতকে পণ্ডিত দামোদর তাঁহার 'সঙ্গীত দর্পণে' ভৈরবীর ব্যাখ্যায় মধ্যমকে বাদী স্বর নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাকে অনুসরণ করিয়া বর্তমানে ভৈরবীর বাদী হিসাবে মধ্যমকে মান্য করা হয়।

বেলাবলী—পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময়সারে' বেলাবলীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা বেলাবলী, বিলাবলী, বেলয়ারী ও বর্তমানে বিলাবল নামে পরিচিত। পার্শ্বদেব ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির এবং ইহাতে কোন বিকৃত স্বরের ব্যবহার নাই বলিয়াছেন। ধৈবত গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থ পার্শ্বদেবকে অনুসরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পণ্ডিত রামামাত্যও ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়াছেন এবং ধৈবতকেই ন্যাস ও গ্রহ বলিয়া স্বীকার করেন। মতান্তরে অবরোহণে রে ও প বর্জিত ছিল বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিত সোমনাথ রামামাত্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত অহোবল 'সঙ্গীত পারিজাতে' বিলাবলকে ঔড়ব-ষাড়ব জাতির রাগ বলিয়াছেন। আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত, গান্ধার ও নিষাদ শুদ্ধ, ষড়জ ও পঞ্চমকে বাদী ও সমবাদী বলিয়া মান্য করা হইত, কিন্তু পণ্ডিত দামোদর 'সঙ্গীত দর্পণে' পার্শ্বদেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সঙ্গীত পারিজাত ও অষ্টাদশে শ্রীনিবাসের 'রাগতত্ত্ববিবোধে' বেলাবলী নামক রাগকে শংকরাভরণ মেলের অন্তর্গত করা হইয়াছে। বর্তমানে শুদ্ধ মেল বলা হয়, তদানীন্তনকালে কাফী শুদ্ধ মেল হিসাবে প্রচলিত ছিল। 'কণ্ঠ কৌমুদী' রচনাকার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতে ইহাতে কড়ি মধ্যম যুক্ত করা হইয়াছে। অন্য সকল স্বর শুদ্ধ, বর্তমানে সম্পূর্ণ জাতি। 'গীতসূত্রসার গ্রন্থের' রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ইহাতে উভয় মধ্যমের ব্যবহার আছে বলিয়া প্রকাশ। দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।

মালবতী ও মালসী—উভয় রাগই দেশজাত রাগ। পার্শ্বদেব 'সঙ্গীত সময়সারে' ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির রাগাঙ্গ শ্রেণীর রাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত অহোবল ইহাতে রে ও ধ কোমল এবং গান্ধার ও নিষাদকে শুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পার্শ্বদেবের মতে সম্ভবতঃ এই রাগ 'মালশ্র' নামের অপভ্রংশ। 'মালবশ্রী' মালব রাগের অঙ্গ ও জন্য রাগ। ইহা সম্পূর্ণ জাতি এবং ইহাতে ষড়জ অংশ ও ন্যাস হিসাবে নির্ধারিত। 'সঙ্গীত রত্নাকর' পার্শ্বদেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পণ্ডিত রামামাত্য ইহাকে ঋষভ বর্জিত ষাড়ব জাতির রাগ এবং 'শ্রী' রাগ মেলের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ষড়জকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। 'সঙ্গীত পারিজাত' রামামাত্যকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধৈবতকে অংশ এবং পঞ্চমকে ন্যাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত সোমনাথ এই রাগকে 'শ্রী' রাগ মেলের অন্তর্গত বলিয়াছেন, ঋষভ ও ধৈবত দুর্বল, ষড়জ অংশ ও

গ্রহ মতান্তরে নিষাদ। 'সঙ্গীত দর্পণে' এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ এবং ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলিয়া পরিচিত। বর্তমানে ইহা কল্যাণ মেলের অন্তর্গত, রে ও ধ বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব জাতির রাগ। সর্বদা তীব্র মধ্যমের ব্যবহার, পঞ্চম ও ষড়জ বাদী ও সমবাদী এবং সর্বকালে পরিবেশিত হয়। মধ্যযুগের বাংলায় ইন্দ্রোত্থান অর্থাৎ বর্ষার সমাপ্তিকাল হইতে দুর্গোৎসব পর্যন্ত মালসী রাগ গাওয়া হয়।[১]

কোড়া—'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে কোড়া রাগকে কোডাড় বলা হইয়াছে। 'সঙ্গীত পারিজাত' ও 'সঙ্গীত দর্পণে' ইহা কুড়ায়িকা নামে অভিহিত এবং সংকীর্ণ রাগের অন্তর্ভুক্ত। 'রাগ দর্পণে' কুড়াই নামাঙ্কিত করিয়া ইহাকে আনন্দসূচক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। 'সঙ্গীত পারিজাতে' এই রাগ শুদ্ধ ঠাটের অন্তর্গত বলা হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে ইহা সম্ভবত সুঘরাই নামে পরিচিত ছিল। পূরিয়া, শংকরাভরণ ও কানড়ার সংমিশ্রণে ইহা সৃষ্ট।

গৌড়—এই রাগ বাংলা দেশের নিজস্ব রাগ। 'কণ্ঠ কৌমুদী' নামক গ্রন্থে এই রাগে রে, গ ও নি কোমল, ম ও ধ শুদ্ধ এবং জাতি সম্পূর্ণ। 'গীত সূত্রসারে' গ ও নি কোমল এবং রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। জাতি সম্পূর্ণ।

ভাটিয়ালী—ভাটিয়ারী নামে একটি রাগে 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'গীত সূত্রসার' নামক উভয় গ্রন্থ অনুযায়ী রে ও ধ কোমল বলিয়া উল্লিখিত। অন্যান্য সব স্বর শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ এবং দিবা প্রথম প্রহরে গেয় বলিয়া স্বীকৃত।

সৌরাষ্ট্রী—ইহা দেশজাত রাগ বলিয়া কথিত এবং ইহা শ্রী বা কর্নাট মেলের অন্তর্গত ছিল।

দেশ বরাড়ী—সম্ভবতঃ এই রাগ দেশ ও বরাড়ী বা বরাটি রাগের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। কবি জয়দেব তাঁহার গীত রচনায় এই রূপের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

কহু—শুভংকরের মতে ককুভ রাগের নাম হইতে 'কুহূ' হইয়াছে। মধ্যযুগে বাংলায় এই রাগ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এই রাগ গোরক্ষপুর জিলায় 'কহুয়া' নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের জাতির নিজস্ব সঙ্গীতের সুর বিশেষ।

১। প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত—১৩৭২—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র।

পঞ্চম—'গীত সূত্রসার' গ্রন্থ হইতে জানা যায় পঞ্চম রাগ ষাড়ব জাতির। পঞ্চম বর্জিত এবং রে কোমল। রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়। ভরতোত্তর যুগে ইহা জন্য রাগ ছিল। এই রাগ অভিজাত দেশী রাগ বলিয়াও কথিত। রাত্রি প্রথম প্রহরে এই রাগ গাওয়া হয়। পঃ ভাতখণ্ডেজী ইহাকে মারবা মেলের অন্তর্গত বলিয়াছেন। এই রাগ দুই ভাবে পরিবেশিত হয়, পঞ্চম বর্জিত ষাড়ব এবং অন্য মতে সম্পূর্ণ জাতির উভয় মধ্যমের প্রচলন আছে। শুদ্ধ ম বাদী, সা সমবাদী স্বর। শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন হিন্দোল, মালকোষ, বসন্ত এবং ললিতের সংমিশ্রণে এই রাগ সৃষ্ট। সা ও ম যথাক্রমে বাদী ও সমবাদী।

নবম অধ্যায়

কাব্যাংশ সংকলন

॥ বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সংকলন ॥

॥ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ॥

লুই পাদ

রাগ—পটমঞ্জরী

১। কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥ ধ্রু ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥ ধ্রু ॥
সঅল (স মা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিড়ি লাহু রে পাস॥
ভণই লুই আমহে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পান্ডি বইঠা॥

২। কাহ্নুপাদ (ভৈরবী)

করুণা পিড়ি খেলহুঁ ণঅ বল।
সদ্গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর।
উআরি উএস কাহ্নু ণিঅড় জিণউর॥ ধ্রু ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥ ধ্রু ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভাণই কাহ্নু আহ্মে ভলি দান্ন দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ॥

৩। ॥ ভুসুকুপাদ ॥

॥ রাগ বঙ্গাল ॥

সহজ মহাতরু ফাড়িঅএ তেলোএ।
খসমসভাবে রে বান্ধ—মুকা কোএ ॥ ধ্রু
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেউ ণ জাঅ।
জিম মণরঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ ধ্রু
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আই অনুঅণারে জামমরণ ভব নাহি ॥ ধ্রু
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব ॥
এথু জাই ণ আবয়ি রে ণ তংহি ভাবাভাব ॥ ধ্রু

৪। ॥ কাহ্নুপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আশা বহল পাতহ বাহা ॥
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ণ উইজঅ ॥
বাটই সো তরু সুভাসুভ পানী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥
জো-তরু-ছের ভেবউ ণ জাণই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥
সুন তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবই সো তরু মুল ণ ডাল ॥

৫। ॥ জয়নন্দী ॥

॥ রাগ শবরী ॥

পেখই সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা ॥ ধ্রু
মোহ—বিমুকা জই মণা। ধ্রু
তবেঁ তুটই অবণা গমণা ॥

নৌ দাটই নৌ তিমই ণ ছিজুই। ধ্রু
পেখ মা-অ মোহে বলি বলি বাঝাই ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা।
বিণি পাখেঁ সোই বিণাণা ॥ ধ্রু
চিঅ তথতাস্বভাবে যোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥ ধ্রু

৬। ॥ চাটিলপাদ ॥

॥ রাগ গুর্জরী ॥

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥
ধামার্থে চাটিল সাংকম গাঢ়ই।
পারগামি—লোঅ নিভর তরই।
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদ আর্দাঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ ॥
সাংকমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়ডী বোহি দূর মা জাহী ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী ॥

৭। ॥ শান্তিপাদ ॥

॥ রাগ শবরী ॥

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউ সে হেরুঅ ন পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা ধুণি ধুণি শুনে অহারিউ।
শুণ লই-আঁ অপুণা চটারিউ ॥
বহল বাট দুই-আর ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুঅতি।
সএঁ সম্বেঅণ বোলথি সান্তি।

৮। ॥ তাড়কপাদ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥

অপণে নাহিঁ মো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহমুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ।
চৌকট্টি বিমুকা জোইসো তোইসো হোই ॥ ধ্রু
জইসন অছিলেস তইসন অচ্ছ।
সহজ পথক জোই ভান্তি মাহো বাস ॥ ধ্রু
বাণ্ড কুরুণ্ড সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী ॥ ধ্রু
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস ॥ ধ্রু

৯। ॥ সরহপাদ ॥

॥ রাগ ভৈরব ॥

কাঅ ণাবড়ি—খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাহী।
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাইউ ণ আণেঁ ॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কুল লই খরসোন্তে উজাঅ।
সরহ ভনই গঅণেঁ পমাত্রঁ ॥

১০। ॥ কঙ্কণপাদ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল-ধাম উইআ তবেঁ ॥

আচ্ছহুঁ চউখন সংবোহী।
মাঝে নিরোহ অনুঅর বোহী ॥
বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা।
অণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥
জথাঁ আইলেসি তথা জান।
মাঝেঁ থাকী সঅল বিহাণ ॥
ভণই কংকণ কল-এল-সাঁদে।
সর্ব্ব বিচ্ছুরিল তথতা নাদেঁ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১। ### তাম্বুল খণ্ড

মালব রাগ ॥ লগনী কুড়ুক ॥

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।
আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।
ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন ॥ ২ ॥
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।
সরুপেঁ কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
সরুপ কহওঁ যবেঁ হওসি[২] সদয়।
আপনার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥ ৪ ॥
আপনার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।
আহ্মার থানত তোর নাহি কিছু ডর ॥ ৫ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥

২। দান খণ্ড

পাহাড়ী রাগ ॥ ক্রীড়া ॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥
জল মাঝে মীনকন্যা করিল গমন।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥
পাণ্ড পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাণ্ড পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে[১] ॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥
নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে।
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে ॥
এহা জানী একমনে পুর মোর আশে।
বাশলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

৩। নৌকা খণ্ড

রামগিরী রাগ ॥ রূপকং ॥

খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে ॥ ১ ॥
তোক দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উল্লাসে।
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে ॥ ধ্রু ॥
ভাঁগিল বলয় তোর নাহিকঁ বসনে।
হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগলিত কাহ্নে ॥ ২ ॥

কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে।
সব বিপরিত দেখোঁ দেহভারে।। ৩ ।।
সরূপ বচন কহ আহ্মার থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪ ।।

৪। ভার খণ্ড

পাহাড়ীআ রাগ একতালী ।। লগনী দণ্ডকঃ ।।

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে।
বড়ায়ি সাখি এঁ বোল সত্য বচনে।। ১ ।।
কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব।
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব।। ২ ।।
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার।
সে সি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার।। ৩ ।।
লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞেঁ আরতী না করী।
গোপত কাজত কাহ্নাঞেঁ ছয় আখি বারী।। ৪ ।।
পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহর।
তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর।। ৫ ।।
তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী।
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী।। ৬ ।।
আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল।
এঁবে ঝাট কর রাধা যৌবন সফল।। ৭ ।।
ভার [না] বহিলেঁ মো না মানো সুরতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৮ ।।

৫। বৃন্দাবন খণ্ড

কোড়া রাগ ।। একতালী ।।

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ।। ল ।।
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহি হৃদয়ে।। ল ।। ১ ।।

তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞি ল।
তোর বিরহ দহনে ॥ ধ্রু ॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
সুতে ধরণী-শয়নে।
অহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥ ২ ॥
এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞির আশে ;
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

৬। বান খণ্ড

মালব রাগ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কণকমেখলা ॥ ২ ॥
শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সুর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর ॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পহ্নী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা ॥ ৫ ॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হুআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬ ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞি।
ধীরে বড়ায়ি খেলিলী তার ঠাঁই ॥ ৭ ॥
তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

৭। বংশী খণ্ড

গুর্জরী রাগ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞি ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আনিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞি [বসে] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

৮। বংশী খণ্ড

মালব রাগ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞি পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকুল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার।
তবেঁ কেহে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরত রৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দলিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞঁ বারে বারে ॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

৯। **রাধাবিরহ**

ধানুষী রাগ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল।

মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে
দধির পসার লঞাঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥

আল।

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥

পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ ॥
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥

যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলা কাহ্নাঞেঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১০। **রাধাবিরহ**

গুর্জরী রাগ ॥ কুড়ুকঃ ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্ন ভুঞ্জে সুখরতী ॥ ১ ॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহি।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী ॥ ধ্র ॥

কদমের তলে থাণে যমুনার কুলে।
শিশু লঞা বাটে হাটে হরিষেঁ বুলে ॥ ২ ॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

॥ মনসামঙ্গল ॥

মর্ত্যে মনসার জন্ম
শিবের পুষ্পবনে যাত্রা

-রচনা বিজয় গুপ্ত

পূর্বে বারানসী রাজা ছিল দিবদাস।
তাহারে ঘুচাইয়া শিব তথায় করে বাস ॥
পৃথিবী দুর্লভ স্থান সেই কাশীপুর।
তথায় বসতি করেন সৃষ্টির ঠাকুর ॥
ভূমি-অন্তরীক্ষ পুরী যজ্ঞগণে রাখে।
দেবগণ লইয়া শিব নিত্য তথা থাকে ॥
মনুষের কিবা কথা দেবে বলে ভাল।
গৌরী লইয়া শিব বঞ্চে চিরকাল ॥
কাশীর যতেক গুণ কহিতে নাহি অন্ত।
হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত ॥
দুর্লভ বসন্ত ঋতু দেখিতে সুন্দর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধ মনোহর ॥
মলয় শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
ভ্রমরা ঝংকার করে পেয়ে মকরন্দ ॥
মধুর লোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কুহু কুহু করিয়া কোকিলা পাখী ডাকে ॥

কুহু কুহু করিয়া কোকিলা গায় সারী।
চারিদিকে চাপিয়া মদনে করে ধাড়ী ॥
পুষ্পিত সকল বৃক্ষ নির্মল ফুল ফল।
কালের প্রভাবে লোকের বাড়ে কুতুহল ॥
একদিন আছেন শিব লইয়া দেবগণ।
হেনকালে আসিল তথায় নারদ তপোধন ॥
নারদ দেখিয়া শিব হাসে ঘন ঘন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মহাদেব বলে, তুমি শুনহ বিশেষ।
কেমন শোভা দেখ মোর বারানসী দেশ ॥
অবিরোধে ত্রিভুবন ভ্রম তপোধন।
বারাণসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান ॥
হাসিয়া নারদ বলে, "শুনহ গোসাঞি"।
বারানসী হেন পুরী কোনখানে নাই ॥
ভুবন দুর্লভ স্থান তোমার বারানসী।
ইন্দ্রের অমরা হইতে রম্য তোমার পুরী কাশী ॥
তোমার প্রাসাদে আমি ত্রিভুবন চড়ি।
কোনখানে নাহি দেখি কাশী হেন পুরী ॥
আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয়।
মনে আছে এক কথা কহিতে বাসি ভয় ॥
সরযুর দক্ষিণ কুলে আছে রম্য স্থান।
চণ্ডিকা করিল তথা পুষ্পের বাগান ॥
নাহি মৃগ পাখী তথা মনুষ্যের গতি।
সেই পুষ্পবনে ফুল ফোটে নানা জাতি ॥
ভাল স্থান করিল দেবী সরযূর কূল।
পারিজাত আদি করি আছে নানা ফুল ॥
রাত্রিকাল হইলে ডাকিনী লইয়া মিলি।
সেই পুষ্পবনে দেবী নিত্য করে কেলি ॥
আর নাহি দেখি স্থান আছে বহুদূরে।
তেমন পুষ্প নাহি দেখি তোমার কাশীপুরে ॥

নারদের কথা শুনি হাসিলা শূলপানী।
চণ্ডিকা সৃজিল ফুল আমি নাহি জানি॥
নিঃশব্দে কহেন কথা নারদের কানে।
"কল্য তথা যাব আমি চণ্ডিকা না জানে"॥
দুইজনে গুপ্ত কথা কহিয়া কানাকানি।
চরণে পড়িয়া মুনি মাগিলা মেলানি॥
ত্রিভুবন বেড়ায় মুনি কোন্দলের আশে।
শিব সম্ভাষিয়া গেলা চণ্ডিকার পাশে॥
ভূমিতে পড়িয়া মুনি বন্দিলা চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি বলে বৈস তপোধন॥
নারদ বলেন, দেবি, আসনে কাজ নাই।
মনে আছে এক কথা কহিব তোমা ঠাই॥
সরযূর দক্ষিণ কূলে তোমার পুষ্পবন।
তোমা ভাণ্ডি কালি তথা থাকেন ত্রিলোচন॥
একেশ্বরে যাবেন তথা কেহ নাহি মেলে।
না জানি কি দৈব ফলে শিব তথা গেলে॥
কহিলাম সকল কথা যে জানি সন্ধান।
বুঝিয়া করহ কর্ম যে হয় সবিধান॥
চণ্ডিকার তরে হেন কহিয়া কথন।
দিব্যরথে আকাশে চলিল তপোধন॥
নারদ যদি ঘরে গেল বেলা অবশেষ।
চণ্ডিকার আবাসে শিব করিল প্রবেশ॥
সাত পাঁচ মনে ভাবে শান্ত নাই মতি।
প্রভুরে চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী॥
আজু কেন তোমার মন না বুঝি গোসাঞি।
মোর ঘর হইতে বুঝি যাইবা অন্য ঠাঁই॥
কার্য্যের গৌরবে যদি যাও দৈবগতি।
যথা যাও তথা মুই যাইব সংহতি॥
এতেক বলিয়া দেবী শুইলা কুতুহলে।
দৃঢ় মুষ্টি ধরিলেন শিবের আঁচলে॥

আঁচলে আঁচলে গ্রন্থি বান্ধিয়া নির্বাস।
হরিষ মনে শুইলা দেবী শিবের বাম পাশ ।।
চণ্ডিকার কথায় শিবের মনে লাগে ব্যথা।
কপট প্রবন্ধে কিছু কহিতে লাগে কথা ।।
কথার রসে দেবীর পাতিয়া গেল মন।
এক সিংহাসনে দোঁহে করিলা শয়ন ।।
চিত্তে সুখ নাই গোসাঞি যাবে পুষ্প বাড়ী।
মিছামিছি নিদ্রা যায় ঘন শ্বাস ছাড়ি ।।
নিদ্রায় ভুলিল মন জানিলা নিশ্চয়।
হরিষ মনে শুইল দেবী খণ্ডিল বিস্ময় ।।
একেশ্বর যাবে দেবী শান্তি নাহি চিতে।
জাগিতে জাগিতে নিদ্রা আইল আচম্বিতে ।।
মাথা তুলিয়া শিব চাহে ঘন ঘন।
নিশ্চয় জানিল দেবীর নিদ্রার লক্ষণ ।।
নাসিকার শ্বাস দেবীর বহে ঘড় ঘড়।
চণ্ডিরে নিদ্রালি দিয়া বাহিরে গেলা হর ।।
হাত জানে কহে কথা নাহি করে শব্দ।
নন্দীরে আদেশ করে সাজাতে বলদ।
শিবের আদেশে নন্দ মস্তকেতে বান্ধি ।।
আথে বাথে বৃক্ষ রথ সাজাইল নন্দী ।।
ঐরাবত হাতী যেন বৃষের শরীর।
সুবর্ণের ক্ষুর দিল খুলের বাহির।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল ঘণ্টা করে ঢন্‌ঢন্‌ ।।
বুকে পৃষ্ঠে চারিপাশে বান্ধিল যাঘর।
লেজে বান্ধিল দিব্য শ্বেত চামর ।।
শ্রবণ নাড়িতে শুনি কিঙ্কিনীর বোল।
দুই শৃঙ্গে তুলিয়া দিল সুবর্ণের খোল ।।
সুবর্ণের ঝিকিমিকি করে মুখখানা।
দেখিয়া কৌতুক বড় বলদের ঠান ।।
বলদ সাজাইয়া নন্দী চাহে এক দৃষ্টে।
লাভ দিয়া চড়ে শিব বলদের পৃষ্ঠে ।।

'চল চল' বলিয়া ঠেলা দিল বাম পায়।
আকাশে উঠিয়া বৃক্ষে বায়ু গতি ধায় ॥
দেব অধিষ্ঠান বৃক্ষ পূজে দেবগণে।
শিবের মন বুঝিয়া চলে পুষ্পবনে ॥
অন্তরীক্ষে চলে বৃক্ষ বায়ু উড়ে ধূল।
আঁখির নিমেষে গেল সরযূর কুল ॥
বিষম দেবের কার্য কেবা বুঝে আঁটে।
বলদ রাখিয়া শিব বসিলা খেয়া ঘাটে ॥
সচকিতে চারিদিক চাহে শূলপানী।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব খেয়ানী খেয়ানী।
কালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।
খেয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার ॥
সরযূ ভরিয়া শিবের আনন্দিত মন।
বৃষ পৃষ্ঠে চড়ি গেলা যথা পুষ্পবন ॥
পুষ্পবনে গিয়া দেখে দেব মহেশ্বর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥
মধুলোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কু কু করিয়া কোকিলা পাখী ডাকে ॥
বিজয় গুপ্ত বলে গাইল, হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত ॥

"পদ্মা বনে মনসার উৎপত্তি"

দেখিয়া পুষ্পের বন আনন্দিত ত্রিলোচন
স্থললিত গন্ধে মনোহর।
সরস বসন্তকালে, বিকশিত ডালে ডালে,
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
চাঁপা নাগেশ্বর জাতি লবঙ্গ মালতী যূথী
কেওয়া কস্তুরী কুরু বক।
টগর মাধবীলতা অশোক অপরাজিতা
করবী যে বকুল তিলক ॥

গোলাপ মল্লিকা ধাই, কুটজ কাঞ্চন জাই
কস্তুরী ধুতুরা শতবর্গ ।
বাসুলী সুরঙ্গ ছন্দ কদম্ব বকুল কন্দ
জবা ফুল দিতে সম অর্ঘ্য ॥
তুলসী মালতী যত তাহা বা কহিব কত,
চতুর্দিকে দেখিতে সুন্দর ।
শ্যামলতা শ্রীফল শেফালী কদমতল
ভূমি চম্পা গন্ধে মনোহর ॥
বন মধ্যে মনোহর অতি রম্য সরোবর
সারি সারি ফুটিল কমল ।
মলয় বসন্ত বায় ভ্রমরা গুঞ্জরে গায়
নানা পক্ষী করে কোলাহল ॥
মধুলোভে মত্তকায় কোকিলে পঞ্চম গায়
ভ্রমরা ভ্রমরী যায় সঙ্গ ।
কামে কৌতুকে মিলি দুই পক্ষী করে কেলি
তাহা দেখি ফেলিল অনঙ্গ ॥
পূর্বে যারে কৈল বধ সেই বৈরী পাইল পথ
মধু মাসে পাইয়া পুষ্পবন ।
কে বুঝে দৈবের গতি যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদন ॥
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতি রসে করে টস মস ।
অতি কামে হইয়া ভোল শ্রীফল বৃক্ষে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস ॥
শঙ্কায় বিকল মন নেহারে কমল বন
চিন্তাতে হৃদয় অসুস্থ ।
সমভ্রমে নামিয়া জলে এড়িল কদম তলে
সরোবরে পাখানিল হস্ত ॥
পদ্ম পত্রে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সহি
পাতালে নামিল মহারস ।
পাইয়া পাতালপুরী জন্মিল নাগনী নারী
দেবকন্যা দেখিতে রূপস ॥

বার্তা পাইয়া নাগরাজে পাতালে বাজনা বাজে
সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে ;
যাহার যেই ব্যবহার দিয়া বস্ত্র অলংকার
বাহাইয়া থুইল পদ্ম বনে ॥
উপজিল বিষহরি আনন্দিত সুরপুরী
প্রসন্ন হইল বসুমতী।
বিজয় গুপ্ত কহে সার মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী ॥
পাতালেতে মনসা জন্মিল শুভ দিনে
নারদ গিয়া জানাইল পিতামহ স্থানে।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত মন।
ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ ॥
বিষ মুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরী।
জগতের হিতকারী নাম জগদ গৌরী ॥
এতেক শুনিয়া নাগ আইল সত্বর।
আতুর লাহিয়া নাগ বসিল মনোহর ॥
মাতৃমত করে দয়া নাহি শিশুভেদ।
সুবর্ণের কাটারি দিয়া নাড়ী করে ছেদ ॥
পাতালেতে নাগগণ করে জয়ধ্বনি।
সাতদিনে নাগগণ করিল উঠানি ॥
মাতৃ ব্যবহার নাগে পদ্মা লইল কোলে।
স্নান করাইতে নিল ভাগীরথী জলে ॥
ভগিনী দেখিয়া নাগ মনে মনে আশা।
বাছিয়া থুইল নাম জয় মনসা ॥
উপজিল বিষহরি জগতের মাও।
অন্তরীক্ষে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
আকাশে ধুমধুমি বাজে বাদ্য ঘন ঘন ॥
মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরষ।
তখনে হইল কন্যা অষ্টম বরষ ॥
পুষ্পবনে পদ্মাবতী আছেন একেশ্বরী।
অযোনী সম্ভবা কন্যা পরমা সুন্দরী ॥

দেবকন্যা হইয়া পদ্মা না জানে আপনা।
নাগিনীর লক্ষণ ধরে কেশমধ্যে ফণা ॥
বিজয় গুপ্ত বলে, 'গাইন', গুণমণি।
মনসা জন্মিলে রে, গাইনেরে দেও ধ্বনি ॥

প্রেম মুগ্ধা : দ্বিজ চণ্ডীদাস

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে পারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥
কোন বিধি সিরজিল শোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বোলি ॥
বন্ধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

— বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংকলন, পৃষ্ঠা-৪৩

নব অনুরাগিনী : দ্বিজ চণ্ডীদাস

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে ॥

নাম পরতাপে যার ঐ দুন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ॥
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

—বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংকলন, পৃষ্ঠা-৫০

আত্ম নিবেদন : চণ্ডীদাস

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি ।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইনু দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে ।
রাধা বলি কেহ বুঝাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপন বলিব কায় ।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর ।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

—বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য একাডেমি, পৃষ্ঠা-৫

গোপন প্রেম : যদুনাথ দাস

কি বলিব আর বঁধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার ॥
গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কিনা বোলে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে ॥
মরি মন দুখে আরে গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া শোধায় হেন নাহি কোন জনা ॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল ॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা সোঙরিয়া ॥
তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে ॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাসে বলে দঢ়াইলে হয় ॥

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস : বাসুদেব ঘোষ

গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ॥

দর্শনোৎকণ্ঠা : প্রেম দাস

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায় ॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনছান করে।
মোরে উপদেশ কর পাসরিতে তারে ॥
এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী ॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥

বংশী সঙ্কট : পরমেশ্বর দাস

আর কি শ্যামের বাঁশী কুলের ধরন থোবে।
নাম ধরি ডাকে বাঁশী বেকত হবে কবে ॥
নিষেধ না মানে বাঁশী সদা করে ধ্বনি।
বাহির দুয়ারে কান পাতে ননদিনী ॥
ননদী জঞ্জাল বড় অন্তর বিযাল।
আসিঞা ঘরের মাঝে পাতিবে জঞ্জাল ॥
যে দেশের বাঁশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নষ্ট।
রাধারে বধিতে বাঁশী এনেছে কানাই ॥
শ্রীপরমেশ্বর দাস কহে শুন রসবতি।
বাঁশীর কোন দোষ নাই কালিয়ার যুগতি ॥

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্য সংসদ

দশম দশা : শশী শেখর

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ-মন্দ-বহনা।
হরি-বৈমুখ হমারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা ॥

কোকিলা কুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনি ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি নামে।
যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নব রাগিণী গানে ॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া।
শশি শেখরে কহে গোচরে
যাওত জিউ ফাটিয়া ॥

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১০৫১

বিরহ বিলাপ : গোবিন্দ দাস

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশ
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রইল বিছুরাই ॥
কো জানে চাঁদ চকোরিনি বঞ্চব
মাধবি মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দ দাস রসপুর ॥

বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-৬৫৮

॥ চণ্ডীমঙ্গল

রচনা—শ্রীকবি কঙ্কণ

(দেব খণ্ড)

মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ
সত্বরে চলিলা চণ্ডী যজ্ঞের সদন।
দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি
হেটমুখে আশিষ করেন প্রজাপতি
আয়ুষ্যাতে জাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি
চিরজীবী হোক স্বামীর সুস্থির সুমতি।
না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন
কোপে কম্পমান তনু বাপে নিবেদন
শুন বাপা তোমারে করি এ অভিমান
সতী ঝিএ তোমার টুটিল অবধাণ।
ধর্ম আদি তোমার জতেক বন্ধুজন
সবারে আসিতে যজ্ঞে কৈলা নিমন্ত্রণ।
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলংকার
শিব পক্ষে ভাল নহে তোমার ব্যবহার।
দুষ্ট দৈবফলেতে তোমার আমি ঝি
না করিল পুণ্যকর্ম নিবেদিব কী।
এমত শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন
সকোপে বলেন বাণী শুনে সর্বজন।
অভয়া-চরণে মজুক নিজ চিত্ত
শ্রীকবি কংকণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমী

(আখেটিক খণ্ড)

মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা
অষ্ট দিকেতে শোভে অষ্ট নায়িকা।
সিংহ পিষ্টে আরোপিল দক্ষিণ চরণ
মহিষের পিষ্টে বামপদ আরোপণ।

বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল
সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ।
অসি চর্ম শূল খড়্গ চক্র শিত শর
আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর।
বামদিকে কার্তিক দক্ষিণে লম্বোদর
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর।
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী
আনম্র কন্দর দেবগণ করে স্তুতি।
তপ্ত কলধৌত জিনি অঙ্গের হইল আভা
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের শোভা।
চারি দিকে নম্রবাণ শোভে জটাজুট
গগনমণ্ডলে তার লাগিয়াছে মুকুট।
অঙ্গদ কঙ্কণ জুতা হইল দশভুজা
জেই রূপে অবনি মণ্ডলে লৈল পূজা।
দেখিআ চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন।
ফুল্লরা পড়িল মহীতলেতে মূর্ছিত
শ্রী কবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

॥ বণিক খণ্ড ॥

ধরি মনোহর লীলা নাচে রামা রত্নমালা
তাণ্ডব দেখেন দেবগণ
তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে কিঙ্কিনী কঙ্কণ।
হইআ মুনি সাবহিত নারদে গায়েন গীত
বীণা গুণে তরল অঙ্গুলী
দোহার তম্বুরে গায় টনক খমক বায়
পিনাক বাজায় কুতুহলী।

ভুবনমোহন কাছে ধ্রুপদ তাণ্ডব নাচে
গান মুনি রাধার বিষাদ
মুখর নূপুরশালি দেন ঘন করতালি
দেবগণ বলে সাধুবাদ।
কনকের গড়ি চুড়ি পরি দিব্য পাটসাড়ি
দু করে কুলপি সাজে শঙ্খ
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।
পীত তড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলী
রজত পাশলি দুটি পরে দিব্য তুলাকাঠি
বাহু বিভূষণ ঝলমলি।
দেবীর আদেশে স্মর হাথে ফুল ধনুশর
হানে বীর সম্মোহিন বাণে
অবশ হইল অঙ্গ কৈল তার তাল ভঙ্গ
শ্রী কবিকঙ্কণ রস গানে !!

চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমী

খুল্লনা রিপুর সিন্ধু করিয়া মঞ্জন
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ।
ফলমূল উপহারে নৈবিদ্য পাঁজলা
করিআ পূজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা।
কিম্বরী বলিআ মাতা জদি থাকে দয়া
বিষম সংকটে আসিব মহামায়া।
অবনি লোটায়্যা স্তুতি করে বারে বারে
অন্তরে জানিঞা চণ্ডী আইলা পূজাগারে।
নখ-ইন্দুভাসে দূর গেল অন্ধকার
কবরি-মল্লিকা মালে ভ্রমর ঝঙ্কার।
চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল
শিরে আরোপিআ পানি চণ্ডী দিলা কোল।
খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মোহ
নেতরে আঁচলে পুছেন নয়নের লোহ।

পরীক্ষা লইতে তারে দিল অনুমতি
আশ্বাস করিল ঝিএ থাকিব সংহতি।
এ বোল বলিআ চণ্ডী রহিলা অম্বরে
ধনপতি পরীক্ষা মানিল উচ্চস্বরে।
খুল্লনা পরীক্ষা লয় দেবীর আদেশে
পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভাষে॥
চণ্ডীর আদেশে বসিল পদ্মাবতী
ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুথি।
সপ্তশলা আদি লগ্ন করিআ বিচার
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার।
নক্ষত্র রেবতী শুভ যোগ রবিবার
ইহা বই বিবাহের লগ্ন নাহি আর।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী করিআ যুগতি
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি।
সুশীলার বিভা বলি পড়িল ঘোষণা
ঘরে ঘরে নাটগীত ব্যালিয বাজনা।
চণ্ডিকা বলেন বাপু শুনহ শ্রীপতি
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী।
নিরামিষ্য কর আজি থাকহ নিঞমে
বিবাহ করাইআ কালি জাব নিজ ধামে।
এমন শুনিঞা সাধু চণ্ডির বচন
অঞ্জলি করিআ তাঁরে করে নিবেদন।
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবি কঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

॥ বণিক খণ্ড ॥

না লাগিল পাটরাণির মোহন-প্রবন্ধ
জামাতার গমনে লাগিল মনে ধন্দ।
সত্বরে চলিল রাণি নৃপ সন্নিধানে
সম্ভ্রমে নৃপতি গেলা জামাতার স্থানে।

বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপু পুর অভিলাষ
বিলম্ব না কর জদি রহ চারি মাস।
এতেক বচন যদি কহিলা নৃপতি
শ্রীপতি বলেন তাঁরে করিআ প্রণতি।
জননি স্মভরি হইল মন উচাটন
নিরোধ না কর রায় ছাড়িব পাটন।
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর
অনুমতি তাহাকে না দেয় সদাগর।
পঞ্চপাত্র সনে রাজা করিআ বিচার
ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার।
রথ তুরঙ্গম দিল ঝারি ঝুরি দোলা
চন্দন-চৌমুরি দিল রত্ন কণ্ঠমালা।
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদএ রায়
চণ্ডিকা মঙ্গল কবি কঙ্কণ গায়॥

॥ ধর্মমঙ্গল ॥

রচনা—মহেশ দাস

মঙ্গল রাগেন গীয়তে

কালুবির মনোরথে গুলতাই বাটল হাসে
পক্ষ মারিবারে তবে নড়ি।
দেখি আগে সরোবরে বসিয়া জাঠির সিরে
আছ ত পানিকাহুরি।
সন্ধানে বাটল বিন্ধে বাজিলে পক্ষের অঙ্গে
উড়ি পড়ে লাউসেনের কোলে।
ধড়ফড় করে পক্ষী লাউসেন সম্মুখে দেখি
লাউসেন জাঞা তুলে।
হেথা কালু পক্ষ পাছে ধাঙ্গা গেলা সেন কাছে
দেখি পক্ষ হাথের উপরে
কহে কালু করপুটে এই পক্ষ মোর বটে
দেখ রূপে বাজিল বাটুলে॥

বাটুল খাইঞা উড়ি আসি তোমা কাছে পড়ি
রাখিলে ত করিঞা জতন।
আমি বটী হিন জাতি বিধি করি দিল বিত্তি
পক্ষ মারি করিএ ভোজন ॥
দিবস উপরে দেখ পক্ষ গুটি মারি এক
তাহা সবে বেচি গণ্ডা দমে।
সেহ কড়ি হাটে লঞা দর্ব্ব্য আমি বেসা (২) হঞা
তবে নির্ভা করি নিজ বাঘে ॥
মোর জত পরিবারে আসা করিয়াছে ঘরে
পক্ষ আনি করিব ভোজন।
জদি পক্ষ্য নাই দিবে কহিব তোমারে তবে
আজি রাত্রি হইব লঘন।
কালুর বচন শুনি লাউসেন বলে বানি
নিবেদন করিএ তোমারে।
পক্ষ্য বিচ জত করি তার দিব দুন কড়ি
এই পক্ষ গুটি দেহ মোরে ॥
প্রাণতত্র পক্ষ আমি আমার স্বরণ পসি
দিলে য়ফরজি হর তায়।
পুরাণের কথা বলি সুন একটিও করি
মহেশ দাসে এসব গায় ॥

ধানশ্রী—রাগ

রচনা—ময়ূর ভট্ট

একে একে সভাজনে মের্লানি করিঞা সেনে
কালু যদি বিরগণে করিঞা সঙ্গতি।
খাটুলি সাগনে করি তাহাতে······
······দিঞা তথি ॥
খাটুলি চালাঞা য়াগে তার পাছু দাসিভাগে
মধ্যে সেন জান য়স্বাপিষ্ঠে।
নানা রঙ্গ কৌতুকে হাথে খাণ্ডা ঢাল বুকে
বিরদাপে চলি জায় পথে ॥

কামরূপ গড়খান লংঘন করিঞা জান
মালসাট মারি বিরভাগে ।
জতেক সহর গ্রাম কতেক লইব নাম
এড়াইঞা জায় বাউবেগে ।।
কথোক দিবস বহি গৌড় নগর পাই
গেলা সভা করি রাজা জোথা ।
কালু আদি বিরভাগে ....
নৃপমানে নোঞাইল মাথা ।।
উঠি রাজা বাহু মিলি সেনে কৈল কোলাকোলি
বৈসাইল লঞা নিজ পাশে ।
সিফাতি নৃপমণি জিজ্ঞ্যাযে কুসল বাণি
কহ যাত্রা মোরে নিজ ভাসে ।।
শ্রীধর্ম মোর গুরু বাৎসা কল্পতরু
হরিনামে সুখিত অন্তর ।
তাহার সেবক কবি মউরভট্ট অনুভবি
বিরচিল অন্নদামঙ্গল ।।

সারেঙ্গ রাগ

রচনা—মহেশচন্দ্র দাস

হেথা বালা লাউসেনে কালু আদি বীরগণে
বসি রহে মণ্ডপ উপর
দেখিয়া নদীর মাঝে সলিল অধিক তেজে
বহে বাণ উড়ে পরথর
ইকুল উকুল ভরি দুকুল বহিছে বারি
ঘূর্ণ গাড়ি চাকের সমান ।
পর্বত সমান ছোটে ঢেউ গোলা নামে উঠে
দেখি কম্পয়ন্তরে পরাণ ।।
কালু আদি বিরভাগে দেখি বাণ দেখি আগে
চমৎকার লাগিল হিআয়
কেহো নাহি স্থির হয় সভাকারে লাগে ভয়
পরমাদ গুণি সচে চায় ।।

স্নঙ্গদ বালির সুত সিতা চাঞা বুলি ভূপ
উতরিলা সমুদ্র নিকটে।
সাগর গভির স্নতি পরমাদ গুণে কপি
ভএ সবে মাথা কৈল হেট ॥
তেনমতি বিরগণে পরমাদ গুণি মনে
লাউসেন পড়িল ফাঁপরে।
বিষাদিত হঞা বলে নাহি ভেলা নৌকা কুলে
কিসে পার হইব দোষরে ॥
গৌড়েশ্বর বরাবরে স্নামি কৈলাম স্নঙ্গিকারে
জিনি দিব ঢেকুরের গড়।
তাহে দুখ দিল বিধি কাল হইল মহানদি
সিন্ধ কিছু নহিল উত্তর ॥
পুনরপি মুখ রাজে দেখাইব কোন কাজে
মহামন্ত্রি হাসিবেক তায়।
হেল বেলে বোধে বালা স্নণ্ডব পাথর ঘোড়া
মহেশ দাস এই রস গায় ॥

বড়াড়ি স্নাগ

রচনা—ময়ুরভট্ট

লাউসেন ঝম্প পিছে স্নাইলা স্নজয় তটে
পদ ভরে ভাঙ্গিল স্নাড়ারি।
পড়িলা স্নাড়ারি মাঝে তরঙ্গ অধিক তেজে
সাতারিঞা জায় রড়ারড়ি ॥
কথোদুরে গেলা জেই স্নাসিঞা কুম্ভির সেই
চারিগুটি পদ নিল কাটি।
তা দেখিঞা লাউসেন চিন্তিতা হইলা মনে
'কিষে স্নার জলে জাবে হাটি ॥
ঘোড়া বলে রঙ্গাস্নুতে চিন্তা না করিহ চিত্তে
লোমে স্নামি জল ভাব পেলি—
ই বোল সুনিঞা কাছে আসিঞা ইছুলি মাছে
একে একে কাটে লোমবালি ॥

পুনরপি বোলে বালা কাটা গেল লোম গোলা
দেখি য়শ্ব বড়ই বিপদে।
ঘোড়া বলে দুই কানে সাতরিঞা জাব বানে
চিন্তা না করিহ হৃদে ॥
আসিঞা কাতলা রুহি কাটিল সে কান দুই
দেখি ত্রাস পাইল আপার।
না করিহ মনে দুখ হেলাঞা জাব বুক
তবু পার করিব পাথার ॥
আসিঞা টেঙ্গারি সিঙ্গি কটাক্ষে ত বুকে বিন্ধি
জরজরে করিল ছেদন।
ছোট বড় মদ্য সঙ্গে আহার পাইঞা রঙ্গে
যশ্বমাংস করিল ভক্ষণ।
একে একে য়ঙ্গ কাটা ঘোড়া হইল বলে টুটা
কিসে তার করিবে পয়ান।
সরিব নাহিখ রয় প্রাণ হইল সংশয়
মউরভট্ট দিজ রস গান ॥

অন্নদামঙ্গল

১। শিবের মোহন বেশ

রচনা—ভারতচন্দ্র

আমার শংকর করুণা কর গো
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
কালকূট পিয়া বিশ্ব বাচাইয়া
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল
অনলে জলে সোঁসর ॥
ভালে সুধাকর গলে বিষম্ভর
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
এ শিবে নিন্দে পামর ॥

২। **শিবের ভিক্ষা যাত্রা**

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু দিমাঝ ঝমাঝ ॥
নাচত ভূত বাজাওত ভৈরব
পঢ়িত তাল বেতালা ॥
নন্দী কহে তাতা কার মনোহর
ভৃঙ্গী বাজাওত গালা ॥
গঙ্গা ঝরে জল চাঁদ সুধারস
অনল হলাহল জ্বালা।
ভারতকে হর শঙ্কর মূরতি
নাশ কপাল কপালা ॥

৩। **অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য**

জয় জগদীশ্বরী জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে ॥
শিব শিবকায়া হর হর জায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে ॥
যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহ হেরম্বে ॥
তব জন যেবা তস্য রিপু কেবা
যম দেই সেবা শিব পরিলম্বে।
ভবজন তরণে রাসহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে ॥

হরিনামাবলী

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব মাতন
জয় পদ্ম লোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥

জয় কেশি মর্দন কৈটভর্দন
গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূত নাবক নাশন ॥

জয় গোপবল্লভ ভক্ত সল্লভ
দেবদূর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জ নাটক
পদ্ম নন্দক মণ্ডল ॥

জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয়
নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয়
দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন ॥

জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত
শতক রাস্তুত বামন।
জয় সর্বতোজয় সজ্জনোদয়
ভারতাশ্রয় জীবন ॥

কাশীতে শাপ

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে ॥

তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥

পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব করে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা
চরণে তরুণ রঙ্গিমা ।।
হইতে সোঁসর শম্ভু হৈলা হর ।
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা ।।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধা করে ধরে কালিমা ।।
ফুল ধনুতনু লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু ধনু বঙ্কিমা ।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা ।।

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ

রচনা—ভারতচন্দ্র

শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীর সিংহ নামে নরপতি ।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ।।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার ।
রাজপুত্রগণ আয় আসিয়া হারিয়ে যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ।।
শেষে শুনি সবি শেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায় ।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণ যুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদায় ।।
'বীর' সিংহ তার পাঠ পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার ।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হইল তার ।।

সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে আরে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতুহল॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণ চন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভা সদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়া॥

সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন

বড় বসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণ সাগর হে॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন ঘেটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুটেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সে করা কখন শাঁখারী
কখন অমুলী তাঁতী মনিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া।
কত ভাব ধরে কত হার করে
রস সিন্ধু তরে ভর তারনিয়া।
নূপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কন কন
বাঞ্চন বানপন কতক নিয়া ॥
লপট লটপট ঝলট ঝট পট
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর
বিষমশর শর দমনিয়া ॥
সখী সকল মিলত মধু মঙ্গল গাবত
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
ঘন বিবিধ মধুর বর মন-ঐ বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বণী বনিয়া
ধিধি ধিককট ধিককট ধিধিকট ধিধি ধই
ঝিঁঝিঁ তক ঝিম তক ঝিম ঝমক ঝমক ঝোই
তত তত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মানিয়া ॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজারাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ॥
রাজা গুণসিন্ধুরায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরের রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত
নানামতে কালীরে পূজিলা।
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।

তোরা মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ॥
দেবী দিলা দিব্যজ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবাণ
পূর্ব সর্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা ॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা।
বিদ্যাসুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাস শিখর উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা।

শাক্ত গীতি

রচনা—রামপ্রসাদ

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়া।
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো ॥
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রঙ মাখাইয়ে
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র, সূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে
অশিব নাশিনী কালী সে কি মাটি ঘর বিচালী
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে।

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

রচনা—রামপ্রসাদ

ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি তত্ব হলি মত্ত,
হরি হর তোর এক হলো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূলকথা মনে বোঝ না,
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
করে আত্ম প্রতারণা।
অসি বাঁশীর মর্ম বুঝে
তোমার কর্ম করা আর হলো না
যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাব না।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা।
তুমি শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাকতে হলে কানা।

রচনা—রামপ্রসাদ

হৃদ কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন পবণে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুসুম্মা মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মা সনাতনী ওমা।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ওমা
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা ॥

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

মুলতান—কাওয়ালী

রচনা—রামপ্রসাদ

কামিনী যামিনী বরণে বামা কে এল রণে
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লসিতা দানব নিধনে।

পদ ভরে বসুমতী সভীতা কম্পিতা অতি
তাই দেখি পশুপতি পতিত চরণে রণে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয় তবে আর কি রে ভয়
অনায়াসে যমণ জয় জীবনে মরণে।

সঙ্গীত সংগ্রহ—রামকৃষ্ণ মিশন

কীর্তন—ঝাঁপতাল

রচনা—রামপ্রসাদ

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলোনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে,
সে কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন, ডাকবি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে॥

সঙ্গীত সংগ্রহ—রামকৃষ্ণ মিশন

রচনা—কমলাকান্ত

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রাখেছো ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রনা সহিতে॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে॥

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

রচনা—কমলাকান্ত

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধু মুখ হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো ?
রতন ভবন মোর আজি হৈল অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে ঐ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষনেক জুড়াও গো ॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে।
বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে ॥
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও
বিধুমুখে 'মা' বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো ॥

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

রচনা—কমলাকান্ত

নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়োয় ॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥
অতি সুশীতল চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায় !
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হতে চায়।

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

রচনা—কমলাকান্ত

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাকতে গাছে।
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে
তরু মঞ্জরে না শুকায় শাখা, দুটা আগুন বিগুন আছে
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে।
জন্ম তারা মৃত্যুহরা তারা নামে হেঁচলে বাচে ॥

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

রচনা—কমলাকান্ত

মজিলে মন ভ্রমরা কালী পদ নীল কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালোয় মিশে গেল,
দেখ, সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ সাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে।
দেখ পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

শাক্ত পদাবলী—কঃ বিঃ

॥ পাঁচালী ॥

১। খট ভৈরবী (একতাল)

রচনা—দাশরথি রায়

সই কে যাবে মধু ভুবনে।
মৃত দেহে তার, জীবন রাধার,
কে দিবে এনে সই। মধুসূদনে ॥
প্রাণ দহে কৃষ্ণ বিরহ তপন,
কে মোর আপন, করে প্রাণপণ
করে নিরূপণ দুঃখের আলাপন,
কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে ॥
ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার,
হরে নিল নীল রতনের হার,
শমন সমান বিরহ প্রহার,
বল কত আর সহে পরাণে ॥
জেনে, সখি। রাখিতে গোকুলে,
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল,
দাশরথি দীনে কবে দিবে কুল,
গোকুলচন্দ্র ভব তুফানে ॥

২। "সুরই যৎ"

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে,
সেই রাধার নয়নাগ্র নব জলদ বরণে,
তার পরিধান পীত বসন, করে বংশী নিদশন,
আসি বলে অদর্শন হৈল বৃন্দাবনে ॥
শুন গো সজনি। শুন না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে ॥
তার কমল যুগল কর, কমলিনী মধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর, চরণ কিরণে,—
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে ॥

৩। ভীমপলশ্রী (একতাল)

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্ম-ময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।
তার এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গীত
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে ॥

৪। বসিলেন মা হেমরবণী, হেরম্ব লয়ে কোলে।
হেরি গণেশ জননী রূপ রানী ভাসেন নয়ন জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি বালিকা সেই তারা
পদতলে বালক ভানু বালক চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু বালক কোলে দোলে
রানী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে।
দাশরথি কহিছে, রানী, দুই তুল্য দরশন
হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্মরূপ গজানন,
ব্রহ্মা কোলে ব্রহ্মা ছেলে বসেছে মা বোলে ॥

রচনা—দাশরথি রায়

৫। কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন সাধে,
রণক্ষেত্রে মা। মোর হৃদয় মাঝে।
দেহের ভেদী ছজন কুজন,
এরা বাদী ভজন পূজন কাজে।
জ্ঞান অসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন—চরণ—সরোজ,
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি,
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে॥

রচনা—দাশরথি রায়

"সোমেন শাহী—গাড্ডিকার গায়েন এবং গায়ন পদ্ধতি।'

অবসর বিনোদনের জন্যই পালাগান। ইহা দৈনন্দিন জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা ও অন্যান্য গ্লানি ও ক্লান্তি দূর করে, কখনও বৃক্ষতলে, কখনও গৃহ সংলগ্ন আঙ্গিনায় বা উন্মুক্ত আকাশের নীচেও পালাগানের আসর আয়োজিত হয়।

পালাগানের মূল গায়ক একজন ও একাধিক দোঁহার থাকে, গায়কের বিশেষ চরিত্রের ভূমিকায় কখনও পুরুষ কণ্ঠে, কখনও নারী কণ্ঠে নানা প্রশ্নের উত্তর দোঁহারের মাধ্যমে রসাপ্লুত হইয়া ওঠে।

পালাগানের গানের ভিতর গদ্যে বর্ণনাংশও পাওয়া যায়।

'সারিন্দা' ইহাতে উল্লেখযোগ্য যন্ত্র।

কাহিনী

মা ও বাপের আদরের বিয়ারী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
ওগো যাই আপনারই দেশে,
সাত মানুর ভাইগী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
লওগো যাই আপনারই দেশে
সাত চাচারে ভাতিজী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
লওগো যাই আপনার দেশে
সাত ভাইয়ের বইনী চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—

লও গো যাই আপনারই দেশে
না যাইবাম না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
না যাইবাম—তোমার দেশে
না যাইবাম না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
না যাইবাম তোমারই বাড়ীতে ॥
মা ও বাপের গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলে সু স্বামী।
সাত মামুর গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলে সু স্বামী।
সাত চাচার গৈরবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
না চিনিলি সু স্বামী ॥
চিনিবে চিনিবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
হারাইয়া বিদুরাইবে—
চিনিবে চিনিবে চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
কান্দিয়া বিদুরাইবে,
শুন শুন শ্বাশুড়ী গো
শ্বাশুড়ী বালা—
কইয়া বুচাই আমি।
আমি তনা যাইবাম বালা
সফরে বাণিজ্যে—
আমি তনা যাইবাম বালা
মোকামের বাণিজ্যে।
আমিত না যাইবাম বালা
লীলারই না দেশেতে ॥

সাধুর বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন

শুন শুন চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
শুন কই তোমারে।

আমিত না যাইবাম বালা
সফরে বাণিজ্যে—
আমিত না যাইবাম বালা
মোকামের বাণিজ্যে।

আমিত না যাইবাম বালা
লীলারই না দেশে—
লীলারই বা দেশে যাইয়্যা আমি বালা
লীলা করবাম বিয়া ॥

শুন শুন জামাই গো
জামাই বালা—
শুন কই তোমারে।
শুন শুন জামাই গো
জামাই বালা—
কইয়্যা বুঝাই তোমারে—
চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
বুঝা অইয়া চিনিব।

চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
সিয়ান হইয়া চিনিব।
চিনিব চিনিব জামাই গো
জামাই বালা—
বালেগা হইয়া চিনিব।
না যাইয়ো না যাইয়ো জামাই
জামাই বালা—
না যাইয়ো সফরের বাণিজ্যে।

না যাইয়ো না যাইয়ো জামাই
জামাই বালা—
না যাইয়ো লীলারই না দেশে ॥
না শুনলো না শুনলো জামাই
জামাই বালা—
না শুনলাইন শ্বশুরীর বাত।
না শুনলো না শুনলো জামাই
জামাই বালা—
না শুনলাইন শ্বশুরীর বচন।

লীলার দেশে আগমন—

শুন শুন মায় গো
মায়া বালা—
কইয়া বুঝায় তোমারে
কিনা স্বপন দেখলাম আজি মায়া
মায় বালা—
আমারই সাধুরে।
আমার সাধু গেছে মায়
মায়া বালা —
লীলারই না দেশে।
লীলারই দেশে গিয়া মায়া
মায়া বালা—
লীলা করছুইন বিয়া
এই না স্বপন দেখলাম মায়া
মায়া বালা—
পালংগে শুইয়া।

চিলাইর পত্র প্রেরণ

আতের আঙ্গুল কাটিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কলম বানাইছে।

কাপড়ের আঞ্চল কাটিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কাগজ বানাইছে।
শইল্লের মাইল তুলিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
এই কালি বানাইছে।
চইক্ষের জল দিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা —
এই কালি গুলিছে।
এই কালি বানাইয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
স্বামীর পত্তর লিখিছে
এক পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
হাসুইন মনে মনে।
দুইয়া পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
ভাবুইন মনে মনে।
তিন পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
কান্দুই মনে মনে।
চাইর পাতা লিখিতে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
চইক্ষ্যের জলে পড়ছে।
পাঁচ পাতা লিখিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
জোরে কাইন্দা উডে।
এইনি পত্তর দেখিয়া চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
বাইরী আইয়া চায়।

বাইরী আইয়া দেখে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মনিষ্যি ত নাই
চতুরবানে চাইয়া দেখে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মনিষ্যি ত নাই।

সরজমিনে চাইয়া দেখে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
মনিষ্যি ত নাই।

আশমানে চাইয়া দেখে চিলাই
চিলাই রাণী বালা—
কাগা উহড়া যায় ॥

শুন শুন কাগরে
কাগা বালা—
শুন কই তোমারে
ছোটু বালার সইগো কাগা
কাগা বালা—
ডাকি যে তোমারে।

ফির অ ফির অ কাগা
কাগা বালা—
তুমি ধর্মের সইয় লাগস্
কেরে ডাকহ চিলাই রাণী
চিলাই বাণী বালা—
কইবা কইবা আমার আগে।

আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
বাস্বাত পইড়্যা কানব।
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
রাখালে ইতাইব।

আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
নিন্দে দুঃখ পাইব।
আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণী
চিলাই রাণী বালা—
ভুগে মইর‍্যা যাইব ॥
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা—
জানু মোইল্যা লইবাম
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা
পিন্দে দুঃখু না দিবাম
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা
কাগা বালা
ভুর্গ নাড়ু খাওয়াইবাম
আমার একটি পত্তর কাগা
কাগা বালা—
লইয়া যাইবা তুমি।
আমার সাধু গেছে কাগা
কাগা বালা—
সফরের বাণিজ্যে মোকামের বাণিজ্যে
আমার সাধু গেছে কাগা
কাগা বালা—
লীলারই না দেশে।
লীলারই না দেশে গিয়া কাগা
লীলা করছে বিয়া
একটি পত্তর লইয়া যাইবা কাগা
কাগা বালা
লীলারই দেশে।
লীলারই দেশে গিয়া কাগা
কাগা বালা—

বট বিরিখে বইবা কাগা
কাগা বালা—
নজর কইর‍্যা চাইবা।
নজর কইর‍্যা দেখিবা কাগা
কাগা বালা—
আমার সাধু নমাজ পড়িবে
নমাজ পড়িয়া কাগা
কাগা বালা
ছেলাম ফিরাইবে।
ছেলাম ফিরাইয়া কাগা
কাগা বালা—
মনাজাত করিবে।
মনাজাত করিয়া সাধু
সাধু বালা
উঠিয়া পড়িবাইন
এমন সময় ফালাইবা কাগা
কাগা বালা—
আমার দুঃখের পত্তর পায়ে।
এই পত্তর লইয়া কাগা
কাগা বালা—
উড়িয়া চলিল আসমানে রে
এই পত্তর লইয়া কাগা
কাগা বালা
সাধুর কাছে গেল
লীলার দেশে গেল।
লীলার দেশে গিয়া কাগা
কাগা বালা
পত্তর সাধুর কাছে দিল
এই নি পত্তর দেখিয়ারে সাধু
সাধু বালা—
হাসুইল মনে মনে

চতুরবানে চাইয়া দেহে সাধু
সাধু বালা
মনিষ্যিত নাইগা।

সাধুর পত্র প্রাপ্তি

কেমুন জনে আনিল পত্তর সাধু
সাধু বালা —
ভাব ছুইন মনে মনে।
এই বিরিখে চাইয়্যা দেখে সাধু
সাধু বালা—
কাগা বইয়া রইছে।
এই নি কাগায় আনছে পত্তর আল্লা
আল্লা বালা—
কার কুশল খবর নারে।
সার দিয়া যাইব গো সাধু
সাধু বালা —
ডাক বাংলারই ঘরে সাধু
সাধু বালা
পালংগে বসিয়া পালংগে শুইয়া
খুলিল চিলাই রাণীর পত্তর সাধু
সাধু বালা—
চিলাই রাণীর পত্তর নারে
এক পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা —
হাসুইন মনে মনে সাধু
দুইয়া পত্তর পড়িতে সাধু
সাধু বালা
ভাবছুইন মনে মনে।
তিন পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
কান্দুইন মনে মনে।

চাইর পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
চইখের জল পড়ে।
পাঁচ পাতা পড়িতে সাধু
সাধু বালা—
জোরে কাইন্দা উঠে।
লর দিয়া যাইন গো সাধু
সাধু বালা—
আন্দর মহলে লীলারই মহলে।

সাধুর প্রত্যাবর্তনের আকাংখা

শুন শুন লীলা গো
লীলা বালা
আমি কইয়া বুঝাই তোমারে।
লীলা বালা—
আমিত না যাইবাম লীলা
লীলা বালা—
আপনারই দেশে—মায়েরই না দেশে
আমারই না দেশে গিয়া লীলা
লীলা বালা—
মায়ের মুখ দেখিবাম।
আমারই না দেশে গিয়া লীলা
লীলা বালা
বাপের মুখ দেখিবাম।

লীলার নিষেধ

শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা—
কইয়া বুঝাই তোমারে।
আমিত না যাইবাম সাধু
সাধু বালা—
তোমারই সঙ্গে নারে।

শুন শুন লীলা
লীলা বালা—
কইয়া বুঝাই তোমারে
বার অ বছরের ছাওয়াল
ছাওয়াল বালা—
দিয়া যাই তোমারে।

সাত খান নাও
নাও বালা—
দিয়া যাই তোমারে।

সাতখান দালান
দালান বালা
দিয়া যাই তোমারে
আমার উমরের কামাই লীলা
লীলা বালা—
দিয়া যাই তোমারে।

শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা—
কইয়া বুঝাই তোমারে
বার অ বছরের লারকা সাধু
সাধু বালা—
আমি তেথানে মারিব।

সাতখান দলান
দলান বালা—
আমি রাজ দিয়া ভাঙ্গিব
সাতখান নাও
নাও গো বালা
পাতিয়া তল করব নারে।

উমরের কামাই সাধু।
সাধু বালা।
আগুন দিয়া পোড়িব নারে।

তবু তনা যাইবাম সাধু
সাধু বালা তোমারই সঙ্গে নারে।
শুন শুন লীলা গো
লীলা বালা —
শুন কই তোমারে।
আজিত না যাইবাম লীলা
লীলা বালা —
তোমার মাও বাপের দেশে।
আসিত না যাইবাম লীলা
লীলা বালা —
আমার মায়ের কোলে।
ছটুবালা ছাড়ছি লীলা
লীলা বালা
আমার মা ও বাপের কোল
গত কাইলে স্বপন দেহি লীলা
লীলা বালা
দেশে যাইতে মন হইছে পাগল
দেশে গেলে ফিইর‍্যা গাইরাম লীলা
লীলা বালা —
না কইর বারণ।
শুন শুন সাধু গো
সাধু বালা —
আমি কইয়্যা বুঝাই তোমারে
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু
সাধু বালা —
তোমারই সঙ্গে নারে
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু
সাধু বালা
তোমারই সঙ্গে নারে
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু
সাধু বালা

তোমারই সঙ্গে নারে
আমারে যে লইয়্যা যাইও গো সাধু
সাধু বালা—
তোমারই দেশে নারে।
আমারে যে লইয়্যা যাইও গো সাধু
সাধু বালা—
ভিখু মাগী খাইব
তোমারে না লইয়া সাধু
সাধু বালা
গাছ তলায় থাকিব।
তবুতনা সাধু গো
ও সাধু বালা—
তোমার কাছু ছাড়া রহিব।

মোমেনশাহী গীতিকা
বাংলা একাডেমী,
ঢাকা

"গোপীচন্দ্রের গান"

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গোপীচন্দ্রের পিতা মানিকচন্দ্র বর্তমান ছিলেন। এই সময় বঙ্গাল দেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন, তবে আলোচ্য অংশ গোপীচন্দ্রের গান নামে পরিচিত, গোবিন্দচন্দ্র নহে। গোপী-চন্দ্রের গানের অন্যতম চরিত্র হাড়ীপা, এর প্রকৃত নাম জালন্ধরী পাদ; তিনি কানুপা অথবা কৃষ্ণচার্যপাদের গুরু ছিলেন বলিয়া কথিত। হাড়ীপা ৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। এই সূত্রেই গোবিন্দ-চন্দ্রকে একাদশ শতকের লোক বলিয়া জানা যায়, কাহারও মতে গোবিন্দচন্দ্র কালক্রমে মুদ্রণ জনিত প্রমাদ বশতঃ গোপীচন্দ্র হওয়া অযৌক্তিক নহে। "গোপী-চন্দ্রের গানে" সন্ন্যাস জীবনকে লইয়া কাব্য সৌষ্ঠব মণ্ডিত একটি বিচিত্র ধারার প্রকাশ পাওয়া যায়।

বন্দনা

প্রথমে প্রণাম করি প্রভুর চরণ ।
কৃপা করি দিল নাথ মনুষ্য জনম ॥
নাথের চরণ যুগে করি নমস্কার ।
কহিব পাঁচালী কিছু চরণে তোমার ॥
তোমার চরণ বিনে তার নাই গতি ।
দিব্যজ্ঞান দিয়া গুরু সাক্ষাতে দিল পোথা ॥
শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যোগে কর মন ।
ধর্মরাজ গোপীচন্দ্র শুনহ বচন ॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধ পুত্র যোগী হইবার ।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহিক মরণ ॥
ময়নামতী বোলে বাপু রাজা গোবিন্দাই ।
অদ্য কথা কহি মায় তোহ্মারে বুঝাই ॥
পন্থের সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা ।
রতন খসিয়া গেলে হারাইবা প্রাণ ॥
অমাবস্যা পালিও পূর্ণিমা প্রতিপাদ
রবিবারে না যাইয় নারীর সাক্ষাৎ ॥
শনিবার রবিবার দিনে মিল হয় ।
বর্বর পুরুষ হৈলে নারী পাশে রয় ॥
রবিবার দিনখানি নব গৃহ স্থাপনা ।
সে দিন ভরিছে মাপা ঘাগরি না করিও উনা ॥
ঘাগরি করিলে উনা দণ্ডেক পাবে সুখ ।
পিত্ত শূল বলিয়া শরীরে হবে দুখ ॥
এক্ষণে না বুঝ রাজা বুঝিবা পরিণামে ।
শুখুনায় ডুবাইলা নৌকা মনের মরমে ॥
কচু পাতার পানি যেন করে টলমল ।
তেনমতে যাবে তোমার যৌবন সকল ॥
নল খাগ কাটিলে যেহেন পরে পানি ।
তেনমতে হইব বাপু তোমার জোওয়ানি ॥
শুনহে রসিকজন এক চিত্ত মন ।
কহেন ভবানী দাসে অপূর্ব কথন ॥

সন্ন্যাস

এরি মতে সকলেতে রহিল ঠাঁই ঠাঁই
পুত্রেক যোগী করে এথা ময়নামতী রাই ॥
নাপিতে আনিয়া রাজার মাথা মুড়াইল।
মুখেতে খেউর করি ভুসঙ্গ চড়াইল ॥
বগলি বগলে দিল শৃঙ্গনাদ গলে।
রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিলেন কপালে ॥
চকমকি পাথর দিল বাটুয়া আধারী।
মত্রভার মেখলি দিল বাঁশের খপরী ॥
গলাতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা।
কটিতে পরিতে মুনি দিল বাঘের ছালা ॥
কর্ণ চিরি মুদ্রা দিল মালা দিল হাতে।
গুরু সেবিতে যায় রাজা মায়ের সাথে।
আগে যায় ময়নামতী পিছে যায় রাজা।
দেখিয়া হায় হায় করে মেহের কুলের প্রজা ॥
কান্দে কান্দে প্রজাগণ করে হায় হায়।
ষোল বৎসরের রাজা দেখ যোগী হয়ে যায়।
প্রজা আদি পাত্র মিত্র লাগিল কান্দিতে।
সব মায়া ছাড়িয়া যায় গুরু সম্ভাষিতে ॥
যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা আছিল বসিয়া।
সেইখানে গেল মুনি পুত্র সঙ্গে লইয়া।
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলায় বসন দিয়া সাক্ষাতে রহিল ॥
হাড়িফা দেখিল যদি যোগীরূপ ধারণ।
দেখিয়া বলেন সিদ্ধা না হবে মরণ ॥
মুনি বলে শুন তুমি গুরু জলন্ধর।
আজ হৈতে হৈল পুত্র তোমার কিংকর।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জান।
এতেক বলিয়া মুনির সঁপিল চরণ ॥
হাড়িফা বলেন মুনি থাক নিজ বাস।
গোপী চন্দেক লয়া আমি করিয়া সন্ন্যাস ॥

এতেক বলিয়া সিদ্ধা আসন তুলিল।
শৃঙ্গনাদ পূড়িয়া সিদ্ধা যাঞা করিল ॥
মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া।
গুরু সঙ্গে রাজা যায় বিদায় হইয়া ॥
সন্ন্যাস হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে যায়।
একুশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে দেয় ॥
সন্ন্যাসে চলিল সিদ্ধা বালক লয়া সাথে।
রাজপথ ছাড়িয়া সিদ্ধা যায় বনপথে ॥
মায়ের বচনে গোপী ছাড়ে শৃঙ্গবাস।
মুকুর মামুদে কয় রাজার সন্ন্যাস ॥

গোপীচন্দ্রের গান
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য